সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

জুন ২০১৬

মানবিক উন্নয়নে যোগ...

উপর থেকে নিচে

১. ১৬ মে ২০১৬ ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সঙ্গে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হকের সৌজন্য সাক্ষাৎ

২. ১৭ মে ২০১৬ শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ও ভারতের এনার্জি ফিসিয়েন্সি সার্ভিসেস লিমিটেডের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, এমপি-র সৌজন্য সাক্ষাৎ

৩. হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার চট্টগ্রাম জেলার কানুনগোপাড়ায় প্রথম ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী সুবিমল দত্তের জন্মভূমিতে অবস্থিত সংস্কৃতি কেন্দ্র পরিদর্শন

উপর থেকে নিচে

১. ১৬ মে ২০১৬ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা, অ্যাম্বাসেডর সতীশ মেহতা ও ভারত থেকে আগত এনার্জি এফিসিয়েন্সি সার্ভিসেস লিমিটেডের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র আনিসুল হকের সৌজন্য সাক্ষাৎ

২. ১৬ মে ২০১৬ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সঙ্গে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ সাইদ খোকনের সৌজন্য সাক্ষাৎ

৩. চট্টগ্রাম সিটি হলে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন ও কাউন্সিলরদের সঙ্গে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সাক্ষাতের সময় তাঁরা একাত্তরে ভারতের ভূমিকার কথা স্মরণ করেন এবং ভারতীয় বিনিয়োগকে স্বাগত জানান

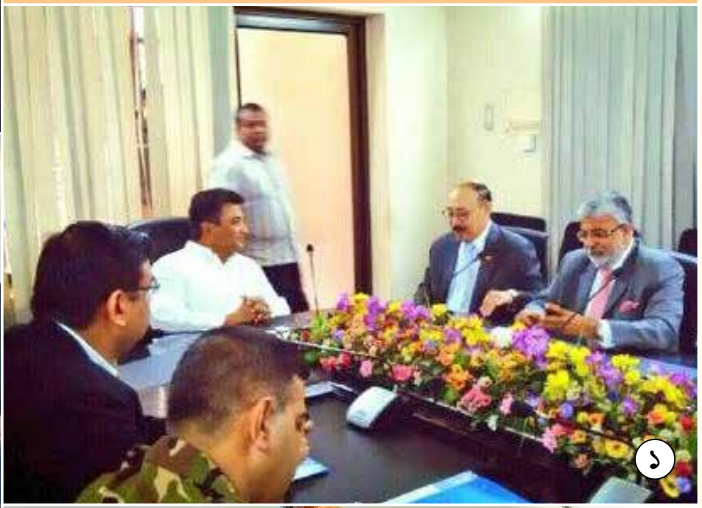

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ চুয়াল্লিশ | সংখ্যা ০৫ | বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩ | জুন ২০১৬

www.hcidhaka.gov.in
Facebook page: /IndiaInBangladesh; @ihcdhaka
IGCC Facebook page: /IndiraGandhiCulturalCentre

Bharat Bichitra
Facebook page: /BharatBichitra

চিলিকা হ্রদের দেশে

পৃষ্ঠা: ৪৬

সূ চি প ত্র

কর্মযোগ — বারিধারায় জমজমাট ঈদ ভিসা ক্যাম্প ০৫
পুনর্মুদ্রণ — যোগ কী এবং কেন ॥ দীপেন সেনগুপ্ত ০৭
প্রবন্ধ — মানবিক উন্নয়নে যোগ ॥ মথুরানাথ কুণ্ডু ০৯
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ড. নরেশচন্দ্র সাহা ১৬
উলট-পুরাণ ॥ দীপক গোস্বামী ৩৩
নিবন্ধ — সুস্থ হোন, সুস্থ থাকুন ॥ জেবুন নেসা ১২
সৌহার্দ — ভারতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ১৫
অনুবাদ গল্প — ফাঁকি ॥ রাজকিশোর পট্টনায়ক ২০
কবিতা — চঞ্চল শাহরিয়ার ॥ দীপক লাহিড়ী ॥ অসীমকুমার বসু সোমনাথ রায় ॥ কাজল চক্রবর্তী ২৪
বিনয় দেব ॥ বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় ॥ দিলীপ কির্তুনিয়া রঞ্জনা রায় ॥ খোরশেদ বাহার ॥ ২৫
ছোটগল্প — কোলবালিশের সতীনের নাম ভালবাসা টোকন ঠাকুর ২৬
বীজ ॥ সুব্রত মণ্ডল ৩৮
ধারাবাহিক — পাসিং শো ॥ অমর মিত্র ২৯
চিলিকা হ্রদের দেশে ॥ দীপিকা ঘোষ ৪৪
শেষ পাতা — স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৪৮

০৮ থেকে ১৫

মানবিক উন্নয়নে যোগ

বিশেষ যোগ সংখ্যা

এই উপমহদেশের কতিপয় আত্মনিষ্ঠ জিজ্ঞাসুর জীবনব্যাপী প্রয়াসের ফসল হল যোগ– যা ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বোত্তম নির্যাস, সামগ্রিকভাবে সমস্ত মানুষের আপন আপন উন্নয়নের সার্বজনীন সোপান। হাজার হাজার বছর পূর্বে আবিষ্কৃত এই যোগ বিদ্যার ফল্গুধারাটি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে কিন্তু লুপ্ত হয়ে যায়নি। সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে জাতিসংঘ ২৫ জুন তারিখটি আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং গত বছর সমগ্র পৃথিবীতে সাগ্রহে পালিত হয়েছে। গতবারের মত এবারও দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হতে চলেছে।

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৯৮৫০১৯৩-৭, ৯৮৮৮৭৮৯-৯১ এক্স: ১৪৯
ফ্যাক্স ৮৮-০২-৯৮৮২৫৫৫
e-mail: informa@hcidhaka.gov.in

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স মো. রেদওয়ানুর রহমান
মুদ্রণ ডটনেট লিমিটেড
৫১/৫১এ পুরানা পল্টন ঢাকা-১০০০ ফোন ৯৫৬২১৯৮

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
বাড়ি নং ২ সড়ক নং ১৪২ গুলশান-১ ঢাকা-১২১২

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

পাঠকের পাতা

জওহর কোট মুজিব কোট

আমাদের কৈশোরজীবনে সুদূর পল্লীগ্রামেও জওহরলাল নেহরুর প্রভাব দারুনভাবে প্রত্যক্ষ করেছি। এর মূলে ছিল জওহরলাল নেহরুর ১০ বছরের কন্যা ইন্দিরাকে লেখা বেশ কয়েকটি চিঠি। ইন্দিরা তার দাদু মতিলাল নেহরুর সঙ্গে গ্রীষ্মাবকাশ কাটাচ্ছিলেন মুসৌরী পাহাড়ের শৈলাবাসে। এই চিঠিগুলি প্রাগ্রসর কিশোর-কিশোরীদের জন্য একটি যুগান্তকারী পথনির্দেশ বললে অত্যুক্তি হবে না। যখন আমরা পড়ছি বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ভিক্টোরিয়া ক্রশ পাওয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সৈনিক খোদাদাদ খান, দানবীর হাজী মহম্মদ মহসীন, জনসেবায় নিবেদিতপ্রাণ ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের জীবনকথা, তখন পৃথিবীর উৎপত্তি থেকে মানবসভ্যতার ক্রমবিবর্তনের নান্দনিক কথামালা সংবলিত এই চিঠিগুলি নতুন চেতনার উন্মেষে ভাস্বর। এর ফলে শিশু-কিশোরদের কাছে জওহরলাল নেহরু হয়ে গেলেন চাচা নেহরু। এই চিঠিগুলির প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বময়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য *Letter From a father to his daughter* বইটি পাঠ্য করা হয়। বলতে দ্বিধা নেই, আমাদের পরিশীলিত দাদপুর গ্রামের রাজেন্দ্র গাঙ্গুলির বাড়ির টিনের চালাঘরের নামকরণ হল এলাহাবাদে নেহরুর পৈত্রিক বাড়ি 'আনন্দ ভবনে'র নামে। বাড়িটির নাম হল সাহেব বাড়ি। বাড়ির লোকরা মৃদুকণ্ঠে কথা বলতেন; তাদের বেশভূষাও ছিল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। স্কুলের ছেলেমেয়েরা তাদের শ্রদ্ধার চোখে দেখত। অবশ্য দরিদ্র ছাত্রদের চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। অনেক বাড়ির মেয়েদের নাম রাখা শুরু হল ইন্দিরা। আমার এক বন্ধু নিরঞ্জন দত্তরায়ের বড় বোনের নাম ছিল ইন্দিরা। ১৯৪৯ সালে আমার প্রথম ঢাকা শহরে এই ইন্দিরাদির ওয়ারির র‍্যাংকিন স্ট্রিটের বাসায় যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। বাবার বন্ধু দুর্গামোহন চ্যাটার্জির মেয়ে ইন্দিরাদির কথা আমার আজও মনে পড়ে। শ্বশুরবাড়ির লোকদের উৎপীড়নে ইন্দিরাদি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মাতৃহারা ইন্দিরাদির জন্য আমার মাতৃদেবীকে প্রায়ই অশ্রু বিসর্জন করতে দেখেছি।

এবার আসা যাক জওহর কোটের বিষয়ে। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বাঙালি মধ্যবিত্তের কোট-প্যান্ট ও শার্ট-টাই পরে সাহেব সাজাই ছিল সেদিনের ফ্যাশন। জওহরলাল নেহরু সেই কোট-প্যান্ট ও হ্যাট-টাই বর্জন করে ধুতির সঙ্গে মানানসই হাতাকাটা সবুজ পরিধেয় হিসেবে যে কোটটি পরিধান করতেন, তাই হয়ে গেল জওহর কোট। তখনকার রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে এই কোট পরার ব্যাপক প্রচলন ছিল। জওহর কোট ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। দেশভাগের পরে পাকিস্তানেও এই কোট ব্যাপক চালু ছিল। বাঙালি রাজনৈতিক কর্মীরা ধুতি এবং পায়জামার সঙ্গে এই জওহর কোট ব্যবহার করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই কোটকে শুধু গুরুত্ব দিতেন তাই না, সর্বদা এই কোট পরিধান করতেন। তিনি পাজামা-পাঞ্জাবির ওপর এই জওহর কোট স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবহার করতেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের সময়ও পাজামা-পাঞ্জাবির সঙ্গে তাঁর গায়ে জওহর কোট ছিল। সাদা পাঞ্জাবির ওপর কালো কোটে তাঁকে দারুন মানাত। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে এর নাম হয়ে যায় মুজিব কোট। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের কাছে মুজিব কোট রাজনৈতিক প্রতীক হয়ে ওঠে। এবার নেহরুর রাজনৈতিক দর্শনের প্রভাব বাঙালিকে কিভাবে মুগ্ধ করেছিল সে কথায় আসা যাক। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর নেহরু যে সংবিধান তৈরি করেন তা ছিল মূলত ধর্মনিরপেক্ষ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের *গীতাঞ্জলির* 'ভারততীর্থ' কবিতায় আছে 'শক হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন'। ভারত হচ্ছে সকল ধর্মমতের অনুসারীদের বসবাসের স্থান। আকবর বাদশাহ্ তার রাষ্ট্রপরিচালনায় দ্বীন ইলাহী বা ধর্মনিরপেক্ষ পদ্ধতি চালু করেন– যার মাধ্যমে ভারতের সকল ধর্মমতের অনুসারীরা একত্রে মিলেমিশে মাতৃভূমি হিসেবে ভারতবর্ষকে দেখতেন। নেহরু মহামতি আকবরের ধর্মনিরপেক্ষ দর্শনকেই আমৃত্যু ধারণ করে গেছেন। বলতে দ্বিধা নেই, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর শুধু নেহরুর ব্যবহৃত কোটই ব্যবহার করেননি, তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার দর্শনকেও বাংলাদেশের সংবিধানে গ্রহণ করেছেন। আরেক জায়গায় নেহরু এবং বঙ্গবন্ধুর চিন্তার ঐকমত্য লক্ষ্য করা যায়। নেহরু যেমন রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীন মূল্যবোধের দর্শনের আলোকে তাঁর রচিত গানকে ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করেছেন, বঙ্গবন্ধুও তেমনি ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত নির্বাচন করেছেন সেই রবীন্দ্রনাথেরই গান। আকবর বাদশাহ্‌র ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা ও দর্শনের আলোকে জওহরলাল নেহরু যেমন উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তেমনি বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও একাত্মতা প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি।

শুরু করেছিলাম বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনে নেহরুর প্রভাব নিয়ে আর শেষ করছি বাঙালির মুক্তি সংগ্রামে নেহরু কন্যা ইন্দিরা গান্ধীর সর্বাত্মক সহযোগিতা

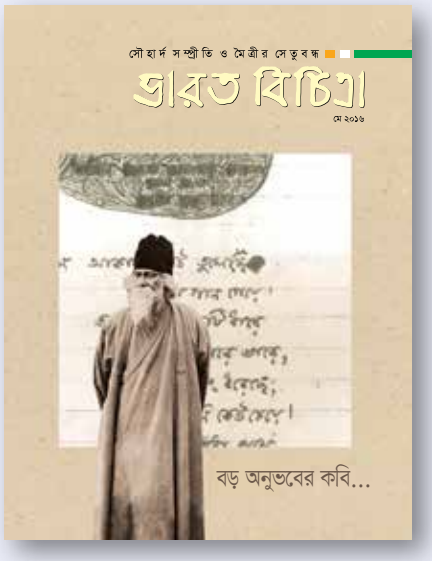

প্রদানের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে। ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁর সংবর্ধনা সভায় ইন্দিরা গান্ধীর কণ্ঠে শ্রুত 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে/ কখন আপনি/ কি অপরূপ রূপে তুমি দেখাও জননী/ ও গো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে...' গানটি যেন এখনও কানে বাজে।

সমীররঞ্জন শীল
নিকেতন, ঢাকা

অনুরোধের চাদর বিছিয়ে

শব্দঘর-এর তৃতীয় বর্ষশুরু সংখ্যায় আপনার দীর্ঘ মন্তব্য লেখাটি পড়েছিলাম। আপনার গদ্য লেখা পড়ার সুযোগ এর আগে তেমন একটা হয়নি। *ভারত বিচিত্রার* সম্পাদকীয় পড়ি। ব্যস, এই পর্যন্তই। যা হোক লেখাটি খুব সাহসী বলে মনে হয়েছিল। আগে-পরের অনেক কিছু এসেছে। ভাল লেগেছিল। আপনাকে ধন্যবাদ।

প্রায় ২/৩ বছর আগে *ভারত বিচিত্রায়* আমার একটা কবিতা ছাপা হয়েছিল। সেটা আমার গ্রামে বেশ আলোড়ন তুলেছিল। গ্রামের সবাই দোকানপাড়ায় বসে কোন এক সান্ধ্যআড্ডায় জোরে জোরে সুর করে পড়েছিল সেই কবিতা।

আমি গ্রামে ফিরে আমার শৈশবের আঠা-লাগানো প্রাইমারি স্কুলে বেড়াতে গেলে এক বোন শিক্ষিকা আমাকে বলেছিল, দাদা, *ভারত বিচিত্রা* হাতে পেলেই আপনার কবিতা খুঁজি। এই কনসেপ্টটা মাথায় রেখে একটা কবিতা লিখেছিলাম 'অপেক্ষা' নামে। সেই কবিতাসহ আরো ২টি কবিতা *ভারত বিচিত্রার* উদ্দেশে উড়ালাম প্রকাশের অনুরোধের চাদর বিছিয়ে।

দিলীপ কির্ত্তুনিয়া
একাউন্টস অফিসার
বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম

সম্পাদকীয়

২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। ২০১৪ সালের ১১ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৯তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে যোগানুশীলনের উপকারিতা সম্পর্কে বিশ্ববাপী সচেতনতা গড়ে তোলার বিষয়ে এক সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জাতিসংঘের এই মহতী উদ্যোগের সংঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে ২০১৫ সালের জুন মাসে *ভারত বিচিত্রা* একটি বিশেষ যোগ সংখ্যা প্রকাশ করে।

যোগানুশীলন একটি প্রাচীন জীবনাচরণ পদ্ধতি যার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করা সম্ভব। ভারতের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা বুঝেছিলেন, শুধু পার্থিব চিকিৎসা ব্যক্তির শরীরের ব্যাধির কিছু উপশম করলেও তাঁর সার্বিক কল্যাণের জন্যে অপার্থিব কিছু প্রয়োজন। যোগ হচ্ছে পার্থিব-অপার্থিবের সেই আশ্চর্য সম্মিলন যার মধ্য দিয়ে মানুষ শরীরে ও মনে সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে। এই চিকিৎসা পদ্ধতিই আজ বিশ্বজুড়ে যোগ, যোগব্যায়াম বা যোগচিকিৎসা নামে খ্যাত। বিভিন্ন চিকিৎসার জটিল প্রক্রিয়ায় ও প্রায়োগিক প্রতিক্রিয়ায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে আজকের মানুষ যোগচিকিৎসা গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে উঠছে।

মনে করা হয় পৃথিবীর প্রাচীনতম সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকেই যোগের উদ্ভব ঘটেছিল। বৈদিকযুগে যোগের বহুল প্রচার ছিল এবং বুদ্ধদেবের সাধনা ও শিক্ষণের একটি বড় অংশ পুড়ে ছিল যোগ ও ধ্যান। অতি প্রাচীনকালেই যোগ চিন জাপান তিব্বত ও অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে।

মনে রাখতে হবে, যোগ কোন ধর্মীয় বিষয় নয় এবং এটি কোনভাবেই হিন্দু ধর্মের সোপান নয়। এটি সম্পূর্ণভাবে মানবিক, প্রক্রিয়ামূলক এবং বিজ্ঞানসম্মত। যোগের সঙ্গে কোন ধর্মেরই কোন বিরোধ নেই বরং এটি বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসীদের নানাভাবে সাহায্য করতে পারে। যোগে কোন মতামত চাপিয়ে দেওয়া হয় না বরং এতে মন বন্ধনহীন উন্মুক্ত হয়। দেহ মন ও প্রাণের মধ্যে ভারসাম্য এনে আমাদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ ঘটানোই যোগের লক্ষ্য। যোগ মানুষের চেতনার সীমাহীন প্রসার ঘটায়, ফলে মনের অন্ধকার দূর হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নৈতিক জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধিত হয়।

২১ জুনকে সামনে রেখে *ভারত বিচিত্রার* চলতি সংখ্যায় যোগ ও স্বাস্থ্যবিধির ওপর ৩টি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করা হল। যোগপিপাসু মানুষ এ থেকে যদি বিন্দুমাত্র উপকৃত হন তাহলে আমাদের উদ্যোগ সার্থক হয়েছে বলে মনে হবে।

পৃথিবীর সর্বত্রই আজ যোগ অনুশীলিত হয়ে থাকে। ভারতীয় পুরাণ ও প্রাচীন পুঁথিপত্রে যোগের মূল নিহিত হলেও আজ আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি জাতি ও সমাজের জীবনে যোগ ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় এখন যোগ-সাহিত্য পাওয়া যায়। যোগ এখন বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য ও কুশল-শিল্পের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

বারিধারায় ভারতীয় হাই কমিশনের প্রথম ঈদ ভিসা ক্যাম্প উদ্বোধনকালে শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা

আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ইতিহাসে এ ধরনের প্রথম ভিসা ক্যাম্প আজ শুরু করছি

৪ জুন ২০১৬ বারিধারায় আয়োজিত ঈদ ভিসা ক্যাম্পে প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান; পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মহম্মদ শাহরিয়ার আলম; সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের উপস্থিতিতে ঈদ ভিসা ক্যাম্পে আগত বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বাংলাদেশের জনগণের উদ্দেশে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা যে বক্তব্য রাখেন, এখানে তা তুলে ধরা হল:

'সবাইকে পবিত্র রমজান মাসের শুভেচ্ছা দিয়ে শুরু করছি।

আজ একটি বিশেষ দিন। আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ইতিহাসে এ ধরনের প্রথম ভিসা ক্যাম্প আমরা শুরু করছি।

এটা সত্য যে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভিসা এবং আপনাদের দেশে আমাদের ভিসা কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব বুঝে ভারতীয় হাই কমিশন এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। বিশ্বের যে কোন জায়গার ভারতীয় মিশনের তুলনায় ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন বৃহত্তমসংখ্যক ভিসা ইস্যু করে থাকে।

এর কারণ হচ্ছে আমাদের অনন্য সম্পর্ক।

দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কোন্নয়নে পররাষ্ট্র সচিবের ঢাকা সফর

১১-১২ মে ২০১৬ ভারতের পররাষ্ট্র সচিব ড. এস জয়শংকর দু'দিনের বাংলাদেশ সফরকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎসহ কর্মব্যস্ত সময় অতিবাহিত করেন। এসময় তিনি সচিব পর্যায়ের একাধিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন

আমাদের মধ্যে রয়েছে দীর্ঘতম ৪ হাজার ৯৬ কিলোমিটার সীমান্ত। গত বছর ১০ লক্ষাধিক লোক বাংলাদেশ থেকে ভারতে গিয়েছে এবং এ সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ থেকে ভারতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চসংখ্যক পর্যটক গিয়েছে এবং বিশ্বের অন্যান্য সকল দেশ থেকে মানুষদের আসার ক্ষেত্রে ভারতের অনস্থল ও বিমান বন্দরের থেকে হরিদাসপুর হচ্ছে তৃতীয় বৃহত্তম পোর্ট অফ অ্যারাইভাল।

প্রতিদিন আমি বাংলাদেশের বন্ধুবান্ধব ও জনগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি যারা কেনাকাটা, সিনেমা দেখা, চিকিৎসা, বন্ধু ও আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের জন্য ভারতে যেতে চান।

এটা যোগাযোগ বৃদ্ধির একটা ইতিবাচক লক্ষণ এবং বিশেষ করে ২০১৩ সালে উভয়দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত সংশোধিত ভ্রমণ চুক্তির পর থেকে দুই দেশের মধ্যে ভিসা ব্যবস্থা সহজীকরণের ফল।

জনগণের যাতায়াত সহজ করার চেষ্টা আমাদের সব সময়ের। ঈদের ছুটি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের জনগণ ভারতে বেড়াতে যেতে চান জেনে এই প্রথমবারের মত আমরা এ উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা চাই নিকটতম প্রতিবেশী হিসেবে ভারতই আপনাদের গন্তব্য হোক।

এই ক্যাম্পে আপনারা ঢাকার বাইরে খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ থেকে আসবেন। বাংলাদেশে আজ ১১টি ভিসা আবেদন কেন্দ্রধ রয়েছে। কোন একক দেশে এটি বৃহত্তম ভারতীয় ভিসা কেন্দ্র। ভারতীয় ভিসা চাহিদা এত বেশি যে, সরবরাহ করতে আমাদের চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। এই ক্যাম্প যদিও ট্যুরিস্ট ভিসার জন্য, তবু অন্যান্য দেশের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ভারতে সর্বোচ্চ সংখ্যক রোগীও যান। গত বছর বাংলাদেশ থেকে এক লাখের বেশি মেডিক্যাল ভিসা দেওয়া হয়েছিল। উভয় দেশের মধ্যে ব্যবসায়ও বাড়ছে এবং আরো আরো বেশি সংখ্যক ভারতীয় কোম্পানি বাংলাদেশে আসছে, বাংলাদেশের কোম্পানিও ভারতে যাচ্ছে।

সবশেষে বলতে হয়, একজন ব্যবসায়ী বা ভ্রমণকারী কী চান? সুযোগ-সুবিধা খুঁজতে বাংলাদেশে আসা ভারতীয় কিংবা ভারতে গমনেচ্ছু বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভিসা যেন ন্যূনতম বাধাও না হয়। আমরা এ ব্যাপারে সচেতন এবং আমাদের পক্ষ থেকে এই ভ্রমণ সহজ করার চেষ্টা অব্যাহত আছে।

আশা করি, বাংলাদেশের বন্ধুরা এই ক্যাম্পের সুযোগ গ্রহণ করবেন। একে সফল করার লক্ষ্যে আমাদের সহযোগিতা করতে আপনাদের অনুরোধ জানাই। এখানে আমরা আপনাদের সাহায্য করতে এসেছি যাতে ভারতে আপনাদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সুখকর হয়। এবং সেই যাত্রাপথের এটা সূচনা।'

বারিধারায় জমজমাট ঈদ ভিসা ক্যাম্প

প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান ৪ জুন ২০১৬ বারিধারায় ভারতীয় হাই কমিশনের ঈদ ভিসা ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মহম্মদ শাহরিয়ার আলম। বাংলাদেশের জনগণের ঈদের ছুটিতে ভারতে যাবার ব্যবস্থা সহজ করার জন্য এই প্রথম ঈদ ভিসা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে বলে হাই কমিশনার তাঁর বক্তব্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ভারতীয় হাই কমিশনের জন্য কনস্যুলার ও ভিসা সেবা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এই ঈদ ভিসা ক্যাম্প বাংলাদেশের জনগণের সুবিধার জন্য এক বড় ধরনের পদক্ষেপ।

ভারতীয় হাই কমিশনের বারিধারায় নতুন চ্যান্সারি কমপ্লেক্সে এই প্রথমবারের মত এ ঈদ ভিসা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণের জন্য এটি উন্মুক্ত প্রথম অনুষ্ঠান।

উদ্বোধনের সময় লাকি ড্র-র আয়োজন করা হয়। তিন ভাগ্যবান বিজেতা জেট এয়ারওয়েজের সৌজন্যে ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা, ঢাকা-মুম্বই-ঢাকা এবং ঢাকা-দিল্লি-ঢাকা সেক্টরের দুটি করে এয়ার টিকেট জিতেছেন। বিজেতারা হলেন ১. হিমাংশু চন্দ্র (ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা), ২. রিনা আফসার (ঢাকা-মুম্বই-ঢাকা), ৩. রাজীব খান (ঢাকা-দিল্লি-ঢাকা)। ভিসা ক্যাম্প থেকে যে-সব যাত্রী টিকেট কিনবেন, জেট এয়ারওয়েজ তাঁদের জন্য বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করেছে।

ঈদ ভিসা ক্যাম্প চলাকালীন ট্যুরিস্ট ভিসা আবেদনকারীরা বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে সরাসরি তাঁদের আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া পরিচালিত ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্র আবেদনপত্র জমা নেবার জন্য বিশেষ কাউন্টারের ব্যবস্থা করেছে।

ঈদ ভিসা ক্যাম্পের প্রথম দিনে অভূতপূর্ব উৎসাহ দেখা যায়। আবেদনকারীদের জন্য ভিসা ক্যাম্প ৪-১৬ জুন, ২০১৬ (সকাল ৮.০০ থেকে দুপুর ২.০০ পর্যন্ত) খোলা থাকবে। শুধুমাত্র ১০ জুন ২০১৬ শুক্রবার ক্যাম্প বন্ধ থাকবে।

• নিজস্ব প্রতিবেদন

চট্টগ্রামে শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার কর্মব্যস্ত দিন

উপরে বামে: জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা ফাউন্ডেশনের অতুলনীয় কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশ সফরকালে ২০১৫ সালের ৭ জুন জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা ফাউন্ডেশনকে দুটি অ্যাম্বুলেন্স উপহার দেবার কথা ঘোষণা করেন। সেই ঘোষণা মোতাবেক অ্যাম্বুলেন্স দুটি বাংলাদেশে এসে পৌঁছলে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় ২৪ মে ২০১৬ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তা জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা ফাউন্ডেশনের কাছে হস্তান্তর করে। গ্রামাঞ্চল থেকে মুক্তিযোদ্ধা রোগীদের শহরে চিকিৎসার জন্য আনা-নেয়ার কাজে একটি অ্যাম্বুলেন্স ঢাকায় ও অন্যটি চট্টগ্রামে ব্যবহার করা হবে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী এ কে এম মোজাম্মেল হক এবং ভারতের হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ জে এম নাসিরউদ্দিন এবং জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা ফাউন্ডেশনের সভাপতি ড. এস এম জাহাঙ্গীর আলমও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন

দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কোন্নয়নে পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে তৎপরতা

উপরে ডানে: ১৪ মে ২০১৬ ইন্ডিয়া হাউসে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব মো. শাহিদুল হক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের সানন্দ উপস্থিতি

দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কোন্নয়নে তৎপরতা

ঢাকায় ১০ মে ২০১৬ ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেত্রী যুগ্ম সচিব (বাংলাদেশ-মিয়ানমার) শ্রীপ্রিয়া রঙ্গনাথনের সঙ্গে BEZA-র নির্বাহী চেয়ারম্যান পবন চৌধুরীর সাক্ষাৎ

দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতায় বাস্তব লাভ

১. ১০ মে ২০১৬ ঢাকায় বাংলাদেশে ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিসর স্থাপনের জন্য প্রথম জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের সম্মেলন; ২. ১০ মে ২০১৬ ঢাকায় নীল অর্থনীতিতে 'ভারত-বাংলাদেশ' জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠকে আবহাওয়া, মৎস্য ও সমুদ্রদূষণ বিষয়ে আলোচনা
নিচে: ভারতের বিদেশ সচিব সুজাতা মেহতার ভারতের ঋণরেখায় নির্মিত বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউটের পরীক্ষাগার পরিদর্শন

পুনর্মুদ্রণ

যোগ কী এবং কেন?

দীপেন সেনগুপ্ত

প্রথমে শরীর, তারপর মনের সম্মিলনে গড়ে ওঠে মানুষের সত্তা। এই পৃথিবীতে সর্বোত্তম প্রাণময় সত্তা হল মানুষ। নিজের জীবৎকালের সীমার মধ্যে মানুষ চায় নীরোগ দেহ ও প্রফুল্ল মন নিয়ে বাঁচতে। কিন্তু একই সঙ্গে সুস্থ শরীর ও আনন্দে পরিপূর্ণ মনের সংযোগ এখন প্রায় দুর্লভ। নানাবিধ আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থাও এই কাজে সাফল্য লাভ করতে পারেনি। অথচ প্রাচীন ভারতের মনীষীরা এমন একটি চিকিৎসা-পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন, যার সাহায্যে মানুষ সুস্থ জীবনযাপনে সক্ষম হবে শরীরে ও মনে। এই পদ্ধতিই আজ বিশ্বজুড়ে যোগ, যোগ্যব্যায়াম বা যোগচিকিৎসা নামে বিখ্যাত। বিভিন্ন চিকিৎসার জটিল প্রক্রিয়া ও প্রায়োগিক প্রক্রিয়ায় বীতশুদ্ধ হয়ে আজকের মানুষ যোগচিকিৎসা গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে উঠছে।

যে রোগহীন জীবনের দিশা যোগচিকিৎসা দিয়েছে তার মূলে আছে যোগদর্শনে উল্লিখিত অষ্টাঙ্গযোগের তৃতীয় অঙ্গ 'আসন'। আসন অর্থাৎ আ-স-ন। 'আ' অক্ষরের অর্থ সর্বত্র। 'স' অর্থাৎ ঈশ্বর। আর 'ন'-র অর্থ জ্ঞান। সর্বত্র ঈশ্বরজ্ঞান অর্থাৎ সমস্ত প্রতিকূলতা, প্রতিবন্ধকতা জয় করে উদার চেতনার পথে উত্তরণই যোগের লক্ষ্য। দেহতরঙ্গকে অবরোধক বিজ্ঞানের দ্বারা জয় করাই আসন সাধনার মূল ও একমাত্র পথ।

যে দেহটা আমাদের কাছে দৃশ্যমান তাকে স্থূলদেহ বা অন্নময়কোষ বলে। আর মানসিক দেহকে তাঁরা চারভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগকে বলেছেন প্রাণময় কোষ, দ্বিতীয় ভাগকে বলেছেন মনোময় কোষ, তৃতীয় ভাগকে বলেছেন বিজ্ঞানময় কোষ, সর্বশেষকে বলেছেন আনন্দময় কোষ। স্থূলদেহ থেকে সূক্ষ্মদেহের পার্থক্য খুব সামান্য। স্থূলদেহের দরকার হল 'প্রয়োজন' আর সূক্ষ্মদেহের দরকার হল 'চাহিদা'।

প্রতিটি আসন করার ক্ষেত্রে উৎসমূল, নামকরণ, আর্ষধারা, মানসিক যোগ্যতা, কী করে করতে হয়, বিকল্প আসন, নিশ্বাস-প্রশ্বাস, ভাবনা, অভ্যাস, সময়, উপকারিতা ও নিষেধ এই বারোটি বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকা জরুরি।

দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহকে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রক্রিয়ায় সঞ্চালন এবং সংস্থাপন করে অর্থাৎ আসনের সাহায্যে দেহের ও মনের রোগ, অবসাদ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

ভারতীয় ঋষিদের মতে, একটা মানুষের দেহের মধ্যে পাঁচটা দেহ বর্তমান। যে দেহটা আমাদের কাছে দৃশ্যমান তাকে স্থূলদেহ বা অন্নময়কোষ বলে। আর মানসিক দেহকে তাঁরা চারভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগকে বলেছেন প্রাণময় কোষ, দ্বিতীয় ভাগকে বলেছেন মনোময় কোষ, তৃতীয় ভাগকে বলেছেন বিজ্ঞানময় কোষ, সর্বশেষকে বলেছেন আনন্দময় কোষ। স্থূলদেহ থেকে সূক্ষ্মদেহের পার্থক্য খুব সামান্য। স্থূলদেহের দরকার হল 'প্রয়োজন' আর সূক্ষ্মদেহের দরকার হল 'চাহিদা'। মানসিক দেহের চাহিদা যখন স্থূলদেহের প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হয়, তখন স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহের দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। তৈরি হয় নানা আধি-ব্যাধি। আধি বলতে মানসিক রোগ বা বিক্ষেপকে বলা হয়। আর ব্যাধি বলতে ধরা হয় শারীরিক রোগ বিকারকে।

পৃথিবীতে প্রতিটি জীবজন্তু গাছপালা মানুষজন যে জীবিত আছে, তার জন্য মহাজাগতিক সূক্ষ্মরশ্মির তরঙ্গ মাথার ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ করে দেহ-মনকে জারিত করে হাত-পায়ের মধ্য দিয়ে বের হয়ে যায়। এটা সুস্থ ও স্বাভাবিক লক্ষণ। কিন্তু বিভিন্ন অবস্থায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সেই তরঙ্গ অনেক সময় ছিন্ন হতে হতে চলে। এভাবে কিছুদিন চলতে চলতে তরঙ্গের একটা বিপরীত তরঙ্গ দেখা দেয়। অর্থাৎ আগে আকাশ থেকে দেহের মধ্যে দিয়ে মাটিতে তরঙ্গ আসছিল, এবার মাটি থেকে দেহের মধ্যে দিয়ে তরঙ্গ আকাশে যেতে আরম্ভ করল। এখান থেকে আধি-ব্যাধি শুরু হল। মাথা থেকে পায়ের দিকে মূল তরঙ্গস্রোত ফিরিয়ে দিতে ও বর্তমানে দেহে প্রবাহিত বিপরীত তরঙ্গকে নিম্নমুখী করতে প্রয়োজন কতগুলো বিশেষ ক্রিয়া। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা এই বিশেষ ক্রিয়াকে ৬৪ ভাগে ভাগ করেছেন– আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম, শুদ্ধাহার, জীবনযাত্রার আচার-বিচার, খাদ্যতত্ত্ব, মালিশ, স্নানবিধি, ভেষজ, ধ্যান, ভগবত উপাসনা প্রভৃতি তার কয়েকটি। এই বিশেষ ক্রিয়া, ৬৪ ধারার মধ্যে দিয়ে সঠিক পথে জীবনকে চালিত করাকে বলা হয় যোগ। কিন্তু নিজেদের অজ্ঞতার জন্য শুধু আসনকে অনেকে যোগ বলে আখ্যায়িত করে থাকে।

অসুস্থ হলে শরীরের স্বাভাবিক রাসায়নিক বিক্রিয়া বিঘ্নিত হয়। ওষুধ এই রাসায়নিক বিক্রিয়া সুসম্পন্ন হতে সাহায্য করে। অসুবিধা হল যে, ওষুধ দেহে প্রবেশ করা মাত্র কাজ শুরু করে দেয়। ফলে রোগীর ঠিক কতটুকু প্রয়োজন তা পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। ওষুধের প্রয়োগ মানে দেহ ও মনের ওপর জোর দিয়ে কাজ করানো। যোগ ওষুধ ছাড়াই এই কাজ সুচারুভাবে করে।

মহর্ষি পতঞ্জলি পাতঞ্জল যোগদর্শনের অষ্টাঙ্গযোগে মানুষকে উত্তরণের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ধারণা, ধ্যান ও সমাধির কথা বলেছেন। যম সাধনায় রয়েছে পাঁচটি অঙ্গ– অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। এটা সম্পূর্ণ মানসিক চেতনা, একে দম অর্থাৎ অন্তরেন্দ্রিয় নিগ্রহ বলা যায় যার ভিত্তি হল আদর্শ। আবার অষ্টাঙ্গযোগের দ্বিতীয় অঙ্গ নিয়মে রয়েছে শৌচ (দৈহিক ও মানসিক শুদ্ধি), সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান। এই নিয়মের অন্তর্গত হচ্ছে শম বা রহিরিন্দ্রিয় সংযম। অষ্টাঙ্গযোগের তৃতীয় অঙ্গ হল আসন। দেহতরঙ্গকে অবরোধক বিজ্ঞানের দ্বারা জয় করাই আসন সাধনার মূল ও একমাত্র পথ।

অসুস্থ হলে শরীরের স্বাভাবিক রাসায়নিক বিক্রিয়া বিঘ্নিত হয়। ওষুধ এই রাসায়নিক বিক্রিয়া সুসম্পন্ন হতে সাহায্য করে। অসুবিধা হল যে, ওষুধ দেহে প্রবেশ করা মাত্র কাজ শুরু করে দেয়। ফলে রোগীর ঠিক কতটুকু প্রয়োজন তা পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। ওষুধের প্রয়োগ মানে দেহ ও মনের ওপর জোর দিয়ে কাজ করানো। যোগ ওষুধ ছাড়াই এই কাজ সুচারুভাবে করে।

দীপেন সেনগুপ্ত
পরিচালক, স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট
অফ কালচার যৌগিক কলেজ
প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অফ কালচার

প্রবন্ধ

মানবিক উন্নয়নে যোগ

মথুরানাথ কুণ্ডু

আজকের দিনে সার্বিক উন্নয়নের বিষয়ে সকলেই আগ্রহী। কেউই পিছনে পড়ে থাকতে চায় না। তবে উন্নয়নের সামনে, পিছনে এবং বর্তমানে বিদ্যমান মানবিক উন্নয়নের বিষয়টি প্রায়ই অবহেলিত থেকে যায়। কারণ আর কিছুই নয়– মানবিক উন্নয়নের সঠিক, সার্বজনীন যোজনার নীল নকশার অভাব। আমাদের দরকার নীরোগ, সুস্থ সবল দেহ এবং পর্যাপ্ত ক্ষমতাসম্পন্ন মন। প্রয়োজন প্রকৃতির সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে, প্রতিবেশীর সঙ্গে তথা বিশ্বমানবতার সঙ্গে আর্থিক যোগ। প্রয়োজন মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ, জীবনের সঙ্গে জীবনযাপনের যোগ এবং বর্তমান জীবনের সঙ্গে মহত্তম আদর্শের যোগ। এই সবকটি প্রয়োজন পরিপূর্ণভাবে মেটাবার যোজনায় যোগের ভূমিকা অনস্বীকার্য। যোগ আমাদের জীবনকে নানাভাবে ফলপ্রসূ করে তোলে, একটি পরিশীলিত জীবনশৈলী হিসেবে Quality of life পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করে, আমাদের জীবনকে একটি শাশ্বত লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায় এবং আন্তরের আলোয় উদ্ভাসিত করে রাখে।

যখন প্রচলিত এবং অধুনা অপ্রচলিত ধর্মসমূহের উদ্ভব ঘটেনি, মানুষের মানসিক প্রয়াস ছিল মুক্ত বিহঙ্গের মত

ভারতের প্রাচীনতম সিন্ধু সভ্যতার সময়ে যোগের প্রচলন ছিল এবং বৈদিক যুগে এর বহুল প্রচার ঘটেছিল। বুদ্ধদেব যোগের প্রচলিত অভ্যাসগুলি নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নীরিক্ষা করেছেন এবং তাঁর শিক্ষণক্রমে গ্রহণ করেছেন। যিশুখৃস্ট তাঁর জীবনের অজানা অধ্যায়টিতে যোগশিক্ষা করেছেন একথা ভাববার যথেষ্ট কারণ আছে। অতি প্রাচীনকালেই যোগবিদ্যা ভারতের সীমা ছাড়িয়ে চিন, জাপান ও তিব্বতে ছড়িয়ে পড়ে।

নাভোচারী, কোন নির্দিষ্ট বিধিনিষেধের আরোপিত বন্ধনে আবদ্ধ নয় তখন এই উপমহদেশের কতিপয় আত্মনিষ্ঠ জিজ্ঞাসুর জীবনব্যাপী প্রয়াসের ফসল হল যোগ– যা ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বোত্তম নির্যাস, সামগ্রিকভাবে সমস্ত মানুষের আপন আপন উন্নয়নের সার্বজনীন সোপান। হাজার হাজার বছর পূর্বে আবিষ্কৃত এই যোগ বিদ্যার ফল্গুধারাটি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে কিন্তু লুপ্ত হয়ে যায়নি। সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে জাতিসংঘ ২৫ জুন তারিখটি আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং গত বছর সমগ্র পৃথিবীতে সাগ্রহে পালিত হয়েছে। গতবারের মত এবারও দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হতে চলেছে।

যেহেতু যোগের প্রচার এবং প্রসার এর আগে কখনও রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় করা হয়নি এবং এর কিছু কিছু অভ্যাস কেবল কয়েকটি দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাই এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা উঠে এসেছে। তাছাড়া যোগের পদ্ধতির প্রচারে সঙ্গে সঙ্গে এর সম্যক ব্যাখ্যা দেওয়ারও প্রয়োজন আছে, প্রয়োজন আছে সব রকম সন্দেহের সমূহ নিরসন ঘটানোর। সেটাই আজকের আলোচ্য বিষয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্রের প্রশ্ন ছিল– আমরা খেলাধূলার মধ্য দিয়ে যথেষ্ঠ আনন্দ পাই নিয়মিত শরীরচর্চাও করি। আমাদের কোন অসুখ-বিসুখ নেই। কেন আমরা আনন্দদায়ক খেলা ছেড়ে একঘেয়ে যোগের অভ্যাসে সময় নষ্ট করব? যোগ তো ফুটবল বা ক্রিকেটের বিকল্প নয় বা হতে পারেও না– তাহলে...। বলা বাহুল্য এরা যোগকে কেবল শরীর চর্চা এবং নিরাময়ের মাধ্যম বলে জেনেছেন তাই এই বিভ্রান্তি।

খেলাধূলায় আনন্দময় শরীরচর্চা হয় সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু আমাদের মাংসপেশী ছাড়াও নার্ভ, গ্ল্যান্ড, মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্কের ব্যায়াম একই সঙ্গে বিশেষভাবে প্রয়োজন, প্রয়োজন মানসিক ব্যায়ামেরও। সেই প্রয়োজন মেটাতে যোগের জুড়ি নেই। তাছাড়া যোগ প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর প্রাণবায়ু ও চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করে তাদের উজ্জীবিত, নিয়ন্ত্রিত ও অধিকতর কর্মক্ষম করে তোলে। ফলে যোগের নিয়মিত অভ্যাসে অন্যান্য উপকারের সঙ্গে সঙ্গে খেলাধূলাতেও অধিকতর কুশলতা অর্জিত হয়। সুতরাং খেলাধূলার সঙ্গে সঙ্গে যোগের অভ্যাসে অনীহা কিসের?

বর্তমানকালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতি হয়েছে এবং সর্বসাধারণ সে উন্নতির ফল সামর্থ্য অনুযায়ী ভোগ করতে পারছেন। এর ফলে জীবন যাপনের মান অনেক উন্নত হয়েছে। তবে মানুষের অন্তরের অবনতির, মানবিক মূল্যহীনতার প্রতিরোধে বিজ্ঞানের বিশেষ কোন ভূমিকা নেই। বরং বলা যায় আমরা বাহ্যিক উন্নতি সত্ত্বেও অনেকাংশে মধ্যযুগীয় মানসিকতার নির্মম শিকার। আমরা অনিয়ন্ত্রিত আবেগ এবং প্রবৃত্তির ক্রীতদাস, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি গতানুগতিক এবং জীববোধ অতিশয় সীমিত। মনুষ্যত্বের সম্যক বিকাশ ঘটাতে আমরা শোচনীয়ভাবে অক্ষম। ভারতীয় যোগীরা মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশসাধনের যোজনা হিসেবেই যোগের আবিষ্কার ও প্রচার করেছেন। সেটি বিস্মৃত হয়ে আমরা আত্মিক অবনতিতে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে মত্ত রয়েছি। যোগের অন্যতম ভূমিকা মানুষের উত্তরণে, মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনে এবং মানুষী সক্ষমতার পরাকাষ্ঠা দেখানোয়।

কাকে বলি যোগ? কিসের সঙ্গে কিসের যোগ? যোগ কোন ধর্ম নয়, হিন্দু ধর্মেরও অঙ্গ নয়। বলা ভাল, আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম, বন্ধ, ক্রিয়া ইত্যাদিও যোগ নয়, যোগের পদ্ধতিমাত্র। নির্দিষ্ট ভাবনাপ্রযুক্ত হয়ে করলে তবেই এদের সুফল ঠিকমত পাওয়া যায়। তাই যোগ কি সে বিষয়ে কিছু জানা দরকার। এই বিশ্বের সমস্ত বস্তু, প্রাণ ও মন অন্তর্নিহিতভাবে একটিমাত্র সত্তায় অধিষ্ঠিত কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবোধ কেবল খণ্ড খণ্ড বোধে যা অজ্ঞানতাপ্রসূত এবং আদপে অসত্য। এই সার্বজনীন ভ্রান্তিই জগৎরহস্যের মূল কথা। যোগ আমাদের বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে মুক্ত করে একত্ববোধে স্থিত করে, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বা Unity in diversity উপলব্ধি করায়। বিজ্ঞানের দিক থেকে আমরা জানি পদার্থের সূক্ষ্ম অবস্থাই প্রাণ বা শক্তি। একটিমাত্র প্রাণ প্রবাহই ভিন্ন ভিন্নভাবে তরঙ্গায়িত হয়ে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শময় জগৎরূপে নিয়ত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। যোগ প্রাথমিক ভাবে এই বিশ্বপ্রাণ বা শক্তির সঙ্গে আমাদের যোগকে চেতনায় উদ্ভাসিত করে এবং কাজে লাগায়। তারপর সামগ্রিক চেতনার সঙ্গে আমাদের খণ্ড চৈতন্যের মিলন উপলব্ধি করায়।

বিষয়টি উদাহরণ দিয়ে বোঝান যেতে পারে। আজকের দিনে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা মুহূর্তে বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞানভাণ্ডার, আনন্দ অনুষ্ঠান এবং মতবাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি কেবল একটিমাত্র যন্ত্রের সাহায্যে ঘরে বসেই। সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে আমাদের শরীর, মন ও প্রাণের সবসময় যোগ আছে কেন-না আমরা প্রত্যেকেই সমগ্র সৃষ্টির সারাংশ। নিজেদের প্রক্রিয়াবিশেষের দ্বারা উজ্জীবিত করতে পারলে আমরা প্রয়োজনীয় সফট্ওয়ারগুলি দেহমনে স্থাপন করতে পারি। আমাদের মেরুদণ্ডের মধ্যে ছয়টি চক্র বা প্রাণকেন্দ্র সুপ্তভাবে অবস্থিত আছে যা পঞ্চভূত এবং মনের কেন্দ্রবিন্দু। এগুলির মধ্য দিয়ে প্রাণপ্রবাহকে যথাযথভাবে চালিত করলে এগুলি জেগে ওঠে এবং আমাদের সার্বিক বিকাশ ঘটায়। এটিই হল কুণ্ডলিনী যোগ যা রাজযোগের অন্তর্গত। রাজযোগ আমাদের অন্তঃপ্রকৃতি জয় করতে অনবদ্য ভূমিকা নিতে পারে। যে অনন্ত সম্ভাবনা আমাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত তার বিকাশ ঘটাতে এর জুড়ি নেই।

যোগের উদ্ভব জানবার অদম্য কৌতূহল থেকেই। আমরা নিজেদের বা পৃথিবীর সব কিছুই যতটুকু জানি তার চেয়ে অনেক বেশি জানি না। তার মূল কারণ চেতনার বিচ্ছন্নতা বা বিযুক্তভাব। আমাদের চেতনা কখনই আমাদের সম্পূর্ণ শরীর, মন ও প্রাণকে জানে না। কেবল কাজ-চলা- গোছের জানে। যোগের মাধ্যমে চেতনাকে সম্পূর্ণভাবে শরীর, মন ও প্রাণের সঙ্গে যুক্ত করলে বিশ্বশরীর. বিশ্বমন, বিশ্বপ্রাণ তথা বিশ্বচেতনার সঙ্গে একীভূত হতে পারা যায়। নিজেদের মধ্য দিয়ে জগৎকে জানা যায়। তাই আমাদের আদর্শ ছিল– আত্মানম বিদ্ধি বা নিজেকে জান। প্রাচীন গ্রিস দেশেও নীতি ছিল– Know thyself । সুতরাং যোগ হল যুক্ত হবার কৌশল– চেতনার অন্তহীন প্রসারণ। এই কৌশলে শরীর, প্রাণ, মন ও চেতনা সবই সামিল। মহর্ষি পতঞ্জলি যোগকে বলেছেন 'চিত্তবৃত্তিনিরোধ'। চেতনার ঊর্ধ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নভূমি থেকে আমরা সর্বোচ্চ ভূমি সত্তামাত্রে অবস্থান করি যখন বস্তু ও মনোজগৎ চেতনায় বা সত্তামাত্রে লীন হয়ে যায়। এটি ধৈর্য্য, নিষ্ঠা এবং অভ্যাসসাপেক্ষ।

ভারতের প্রাচীনতম সিন্ধু সভ্যতার সময়ে যোগের প্রচলন ছিল এবং বৈদিক যুগে এর বহুল প্রচার ঘটেছিল। বুদ্ধদেব যোগের প্রচলিত অভ্যাসগুলি নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নীরিক্ষা করেছেন এবং তাঁর শিক্ষণক্রমে গ্রহণ করেছেন। যিশুখৃস্ট তাঁর জীবনের অজানা অধ্যায়টিতে যোগশিক্ষা করেছেন একথা ভাববার যথেষ্ট কারণ আছে। অতি প্রাচীনকালেই যোগবিদ্যা ভারতের সীমা ছাড়িয়ে চিন, জাপান ও তিব্বতে ছড়িয়ে পড়ে। একালে আমেরিকা ও ইউরোপে রাজযোগের বহুল প্রচার বর্তমান আছে। যোগের সবচেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ মহর্ষি পতঞ্জলির যোগসূত্র ও হঠযোগ-

প্রদীপিকা। স্বামী বিবেকানন্দ বিদেশে যোগের বহুল প্রচার করেছেন। যোগের বিষয়ে শ্রী অরবিন্দের Synthesis of yoga এবং পরমহংস যোগানন্দের Autobiography of a Yogi বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাধারণত যোগের নামে যা শেখানো হয়– আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম ইত্যাদি হল হঠযোগের অন্তর্গত। এগুলি প্রকৃত যোগের প্রারম্ভিক সোপান। তবে সর্বসাধারণের জন্যে এগুলিই আকর্ষণীয় এবং গ্রহণীয়, তাই হঠযোগের ব্যাপক প্রচার। এগুলি শরীর মন সুস্থ এবং নীরোগ রাখতে বিশেষ মূল্যবান। তাছাড়া অনেক উৎকৃষ্ট দুরারোগ্য অসুখ যার চিকিৎসা নেই বললেই চলে যেমন উচ্চ রক্তচাপ, বহুমূত্র, বাত, মৃগী ইত্যাদি যোগের দ্বারা স্থায়ী নিরাময় হয়। তবে এসব ক্ষেত্রে যোগাভ্যাস দক্ষ নির্দেশকের তত্ত্বাবধানেই করা উচিত।

এছাড়া মানসিক চাপ বা Stress নিয়ন্ত্রণে বা Depression দূর করতে যোগের বিকল্প নেই। যোগ Stress-এর শারীরিক এবং মানসিক কারণগুলি দূর করে এবং জীবনে ভারসাম্য আনে। আজকাল Management of Stress নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। তবে এই বিষয়ে সামান্য মাত্রায় যোগও অত্যন্ত ফলদায়ী। নিয়মিত যোগাভ্যাসে দেহ, মন এবং প্রাণের মধ্যে একটা সুষম ছন্দ আসে, চাপ দূর হয়, জীবন আনন্দময় হয়ে থাকে। প্রাণিজগতে মানুষের প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব শারীরিক নয় মানসিক। যোগের মাধ্যমে এই মানসিক ক্ষমতার প্রভূত বিকাশ সাধন করা যায়। যোগ আমাদের আবেগকে পরিশুদ্ধ করে, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ করে, মনসংযোগের ক্ষমতা বাড়ায় এবং আশা, নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, সাহস, আত্মবিশ্বাস, প্রভৃতি মানসিক গুণাবলি বৃদ্ধি করে। আজকাল সমস্ত উন্নত দেশে Emotional Intelligence নিয়ে পঠনপাঠন শুরু হয়েছে। যোগের প্রক্রিয়া এ বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখে। যোগের দ্বারা প্রবৃত্তি এবং আবেগ সংযত থাকে এবং সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়। আজকাল যোগের এই দিকটি সমগ্র পৃথিবীর সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

বস্তুত যোগকে কেবল শারীরিক সুস্থতা বা নিরাময়ের কারণে ব্যবহার করা সমীচিন নয়। কেউ একটি দামী কম্পিউটার কিনে সেটি কেবল টাইপ করবার জন্যে ব্যবহার করলে যেমন তার সদ্ব্যবহার হয় না তেমনি কেবল হঠযোগে আবদ্ধ থাকাও প্রকৃত যোগের প্রয়োগ নয়। এ প্রসঙ্গে বলা যায় আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জার্মানি প্রভৃতি দেশে যেখানে যোগের প্রচার অনেক আগে থেকেই বর্তমান সেখানে হঠযোগের কোন প্রাধান্য নেই। তারা বিশেষভাবে রাজযোগের প্রক্রিয়াগুলির প্রতিই আকৃষ্ট এবং সেগুলিকেই নামে বা বেনামে উন্নয়নের সোপান হিসেবে নানাভাবে ব্যবহার করে চলেছে এবং তার বাজারদরও সামান্য নয়।

রাজযোগ কমবেশি সবাই অভ্যাস করে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সুফল পেতে পারেন। তবে রাজযোগের অভ্যাস কোন গুরু বা নির্দেশকের সহায়তা ছাড়া করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। এছাড়া মানসিক প্রবণতা, রুচি এবং অধিকারী ভেদে অন্যভাবেও যোগাভ্যাস করা যায়। যাঁরা বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায় আনন্দ পান তাঁরা নিয়ত আত্মানুসন্ধান বা 'আমি কে?' এই বিচারের দ্বারা জ্ঞানযোগের অভ্যাস করতে পারেন। যাঁরা স্বভাবতই ঈশ্বরে বিশ্বাসী ও ভক্তিপ্রবণ তাঁরা ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা ও সমর্পণের মাধ্যমে ভক্তিযোগের অভ্যাস করতে পারেন। কোন ফলের প্রত্যাশা না করে সবসময় নির্লিপ্তভাবে অহংশূন্য হয়ে কাজের মাধ্যমে আমরা কর্মযোগের অভ্যাস করতে পারি। তবে সবচেয়ে ভাল যোগসমন্বয় বা রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের একসঙ্গে অভ্যাস করা, কেন-না প্রাথমিক স্তরে এরা পৃথক পৃথক প্রতীয়মান হলেও পরে একটিমাত্র ধারায় পর্যবসিত হয়ে যায়।

যোগের সবচেয়ে প্রামাণ্য এবং বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থ হল মহর্ষি পতঞ্জলির *যোগসূত্র*। মাত্র ১৯৫টি সংক্ষিপ্ত সূত্রের মাধ্যমে তিনি যোগের উপর অপূর্ব আলোকপাত করেছেন। তিনি যোগের আটটি অঙ্গ বা আষ্টাঙ্গযোগের কথা ব্যাখ্যা করেছেন যা যোগের উপর একটি সামগ্রিক ধারণা এবং প্রক্রিয়ামূলক আলোচনা– 'যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমধিয়োহষ্টাবঙ্গানি।'

যম নামে প্রথম ধাপের অর্থ হল পাঁচটি নীতিপালন– অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, ইন্দ্রিয়সংযম এবং অপরিগ্রহ বা অন্যের দান গ্রহণ না করা। এরপর আসছে নিয়ম বা পাঁচটি চারিত্রিক বিধি– শৌচ, সন্তোষ, স্বাধ্যায়, তপস্যা ও ঈশ্বর প্রণিধান। দেহমনের পবিত্রতা রক্ষা করা, পরিতৃপ্তির ভাব ধারণ করা, শাস্ত্রপাঠ বা আত্মানুসন্ধানে রত থাকা এবং ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করা। এই নীতিগুলি অবশ্য পালনীয় এবং যোগে উন্নতির জন্যে অপরিহার্য।

এরপর তৃতীয় ধাপে আছে আসন। হঠযোগের প্রক্রিয়াগুলি যা সাধারণত যোগ নামে অভিহিত তা এই আসন বা মুদ্রার অন্তর্গত। তবে রাজযোগে আসন মানে যে অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ মেরুদণ্ড সোজা রেখে নিশ্চলভাবে অবস্থান করা যায় তাই আসন নামে অভিহিত হয়। এরপর প্রাণায়াম অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে প্রক্রিয়াবিশেষের দ্বারা প্রাণশক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ এবং চেতনাকে সংহত করা। পঞ্চম ধাপ হল প্রত্যাহার বা ইচ্ছামাত্র মনকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ থেকে তুলে নেওয়া। নানা বিষয়ে নিয়ত বিক্ষিপ্ত মনকে সংহত করা সম্ভব হয় প্রাণায়ামের এবং ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে। এর পরের ধাপ ধারণা– অর্থাৎ মনকে একটি বিশেষ চেতনাকেন্দ্রে স্থির করে রাখা। সপ্তম ধাপ ধ্যান হল নিরবিচ্ছিন্নভাবে কোন বিষয়ে এক নিবিষ্ট চিন্তাপ্রবাহ চালাতে থাকা। প্রকৃত ধ্যান হল অতীন্দ্রিয় সাধনা, চৈতন্যস্বরূপে বা সত্যস্বরূপে নিরবিচ্ছিন্ন অবস্থান। শেষ ধাপ হল সমাধি অর্থাৎ ধ্যানের প্রকিয়া, ধ্যানের বিষয় এবং ধ্যাতার একীভূত হয়ে যাওয়া। যার ফলে শরীর, মন, প্রাণ, চেতনা সবই অন্তহীন প্রসারিত দেখা যায় চেতনার কেন্দ্রবিন্দু থেকে দ্রষ্টাস্বরূপে।

এই চেতনার বহুব্যাপ্ত প্রসারণে লাভ হয় মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা ও উপরতি। নিজেকে সকলের সঙ্গে এক বোধ হলে অহংভাব মাথা তুলতে পারে না, মানুষে মানুষে মৈত্রীভাব স্বতঃস্ফূর্তভাবেই জাগ্রত হয়। দুঃখী, বিপদগ্রস্ত এবং অসহায় মানুষের প্রতি একাত্মবোধ সহানুভূতি জাগে যা করুণা নামে অভিহিত। সুখী মানুষজনের সুখে ঈর্ষার বদলে হর্ষ বা মুদিতা জাগে। অন্যের দোষ-ত্রুটির প্রতি আত্মজনবোধে উপেক্ষার ভাব আসে এবং স্বীয় স্বার্থমূলক ভাবনার নিবৃত্তি ঘটে, সকলের ভাল যাতে হয় তা করবার আন্তরিক প্রবৃত্তি ও প্রেরণা আসে। আর এ সবের ফলে অন্তরে অন্তরে জাগতিক জীবন মধুময় হয়। আমরা এ জগতের বাসিন্দা হয়েও অপার্থিব মনোভাব ও পরম আনন্দের অধিকারী হই। মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা বিযুক্তভাব যা কুয়ার ব্যাঙের মত আমাদের সংকীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থান্বেষণেই মগ্ন রাখে। এর থেকে মুক্ত হবার উপায় যোগ যা কেবল বুদ্ধিকে নয় সমগ্র সত্তাকে রূপান্তরিত করে।

আমাদের বিশেষ সমস্যা হল অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তি ও আবেগ যা আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও দাসত্ব করায় এবং অনর্গল চিন্তাপ্রবাহ যা মনকে সবসময়ে অকারণে আমাদের অজান্তেই নিয়োজিত রাখে, একাগ্রতা হ্রাস করে ও অযথা সময় ও মানসিক ক্ষমতার অপচয় ঘটায়। প্রয়োজনীয় বিষয়ে আবিষ্ট হতে দেয় না। এই সবই উন্নতির পরিপন্থী যা যোগের দ্বারা দূর করা সম্ভব।

যোগের প্রত্যেকটি প্রক্রিয়াই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগের মূল ধারণার ধারক এবং বাহক। এরা শরীরের উপর প্রাণ এবং মনের প্রভাব উপলব্ধি করায়, জাগতিক কার্যকারণ সম্বন্ধকে বুঝিয়ে দেয় এবং প্রেরণার সঙ্গে উত্তরণের পরবর্তী সোপানের দিকে এগিয়ে দেয়।

যোগের প্রকৃত লক্ষ্য হল নিজের মধ্যে নিজেকে জানা যার ফলে অন্যকে বা সবকিছুই জানা যায়। নিজেকে জানার প্রাথমিক লক্ষণ হল সম্পূর্ণ শরীরবোধ থেকেই দেহাত্মবোধের লয়। এই দেহটাই যে আমি নই বা আমার নয় এই ভাবনা দৃঢ় হলে চিত্তশুদ্ধি ঘটে এবং যাবতীয় বিরোধ ও দুঃখের লয় হয়। আমাদের সমস্ত দুঃখের মূল কারণ পাঁচটি– অবিদ্যা, অস্মিতা, অনুরাগ, বিরাগ ও মৃত্যুভয়। যোগের ফলে এই পাঁচটি আত্যন্তিক দুঃখের অবসান হয়, শুদ্ধচেতনার সঙ্গে আমাদের সম্যক সংযোগ হয় যা দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যেও অটুট থাকে। আসন, মুদ্রা ও লঘু প্রাণায়াম যা সর্বসাধারণে প্রচারিত তাও নিঃসন্দেহে অশেষ কল্যাণকর, দুরারোগ্য রোগহর এবং দৈহিক ও মানসিক নিরাময়কারী। তবে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে আরও উপরে মনুষ্যত্বের সর্বোত্তম বিকাশের দিকে। তাই বহিরঙ্গ যোগের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগের অভ্যাসও অত্যন্ত প্রয়োজন। অন্তর্জাতিক যোগদিবস পালনের কল্যাণে আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে যোগের দিকে আবদ্ধ হোক এটাই প্রত্যাশা।

মথুরানাথ কুণ্ডু
ভারতের যোগ-গবেষক ও প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

‘সুস্থ হোন, সুস্থ থাকুন’

আন্দোলনের পটভূমি

জেবুন নেসা

‘সুস্থ হোন, সুস্থ থাকুন’ নামে এক পৃষ্ঠার একটি পরামর্শপত্র লিফলেট আকারে আমি সর্বসাধারণের মধ্যে বিলি করে আসছি ১৯৯৩ সাল থেকে। বাইশ বছর হয়ে গেল। ইতোমধ্যে দুয়েকটি ছোটখাটো সংযোজন ছাড়া লেখাটি একইরকম আছে। বদলানোর কোন কারণও নেই, যেহেতু আমাদের স্বাস্থ্যের সমস্যাগুলো সামাল দেয়ার জন্যে মূল করণীয় একই আছে এবং আশা করা যায় ভবিষ্যতেও থাকবে। এক কথায় এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাটিকে সচল রাখা। অনেক অসুখই হয়তো সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে নিরাময় হয়, কিন্তু অসুখ হলে রোগীর ভোগান্তি, আপনজনদের দুশ্চিন্তা, চিকিৎসার জন্যে অর্থব্যয় এবং তা মেটাতে স্বল্পবিত্ত মানুষকে ধারদেনা, এমনকি ভিক্ষার হাতও বাড়াতে হয়। পাশাপাশি রোগী উপার্জনশীল ব্যক্তি হলে তার আয়-রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং সে কারণে জাতীয় উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়া ইত্যাদি বিবেচনা করলে প্রত্যেকে সঠিক খাদ্যাভ্যাস, যোগ ব্যায়ামসহ অন্যান্য ব্যায়াম, আকুপ্রেশার ও আরও কিছু সু-অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে সুস্থ থাকাটাই লাভজনক। তাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্লোগানেও দেখি সেই পুরনো প্রবাদ: ‘নিরাময়ের চেয়ে প্রতিরোধ শ্রেয়’ এবং ‘তুমি যা জানো তা অন্যকেও জানাও’।

তবে অন্য অনেকের মতই আমিও এ কথার মর্ম বুঝতে পেরেছিলাম কঠিন অসুখে ভুগেই। এমনিতে ছোটবেলা থেকে রোগা ছিলাম। হাঁপানীর কষ্ট ছিল এবং সবজিজাতীয় খাবারে অনীহা থাকার ফলে কোষ্ঠকাঠিন্যেও ভুগতাম। তখন খাদ্যাভ্যাসের গুরুত্ব জানা না থাকায় শুধু ওষুধের ওপর নির্ভর করতাম বলে সেটা মোটেও সুস্থ স্বাভাবিক জীবন ছিল না। বংশগত দিক থেকেও যে আমি ঝুঁকিতে ছিলাম তার প্রমাণ হচ্ছে আমার মা ৩৫ বছর বয়সে খাদ্যনালীর ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ৩৯ বছর বয়সে মারা যান।

মায়ের মৃত্যুর সাড়ে তিন বছর পরে বাবাও মারা গেলেন, হঠাৎ স্ট্রোক করে। আমরা একেবারেই অভিভাবকহীন হয়ে পড়লাম। কিন্তু ঢাকার মগবাজারে আমাদের ১২ কাঠা জমি ও একটি একতলা বাড়ি থাকায় কিছু লোভী আত্মীয়-অনাত্মীয় মানুষ অভিভাবকের ছদ্মবেশে সামনে এসে দাঁড়াল।

কান্সারে ভুগছিলেন আমার নানীও। তিনি মারা গেলেন এর ঠিক পঁচিশ দিন পরে। এর আগে নানীর এক ভাই, পেশায় চিকিৎসক, ক্যান্সারে মারা গিয়েছিলেন। এর পরের দু'বছরে আমার বাবা-মা দু'পক্ষের আত্মীয়দের মধ্য থেকে আরও ১১জন মারা গেলেন বিভিন্ন অসুখে ভুগে।

মায়ের মৃত্যুর সময়ে আমি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিলাম। শোকের সাগরে ভাসতে ভাসতে কোনরকমে পরীক্ষা শেষ করলাম। আমরা ছিলাম নয় ভাইবোন, আমি সবার বড়। এ অবস্থায় আমি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। প্রায়ই অজ্ঞান হয়ে যেতাম। আর মনে হত নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। মনের যন্ত্রণায় শরীর এত দুর্বল হল যে, একটু বেশি পরিশ্রম করলেই বমি হত। গতানুগতিক চিকিৎসায় খুব একটা কাজ হচ্ছিল না। অথচ ছোট আটটি ভাইবোনের জীবনধারণ ও লেখাপড়ার জন্যে আমার সুস্থ থাকাটা আবশ্যিক ছিল। তাই নানাভাবে মনকে বুঝিয়ে কর্তব্য পালনের জন্যে ন্যূনতম সুস্থ থাকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার বাবা সাধারণ সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন। উপার্জনের তুলনায় তাঁর পরিবারের আর্থিক প্রয়োজন বেড়ে চলছিল। সব মিলে আমার দিশেহারা অবস্থা। এদিকে মায়ের মৃত্যুর পরে ছয় মাস না পেরোতেই আমাদের সবার ছোট ভাইটি অল্প জ্বরে ভুগে হঠাৎ মারা গেল।

ছোটবেলা থেকে আমার ইচ্ছে ছিল ডাক্তারি পড়ার। এখন মনে হল, কই, ডাক্তাররা তো আমার আপনজনদেরকে অকালমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারছেন না। হতাশ হয়ে পড়লাম। সংসারের টানাপোড়েনও বেড়ে চলছিল। তাই ডাক্তারি পড়া তো দূরের কথা, সাধারণ ডিগ্রি কোর্সটাও চালিয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। তখন আমার এক আত্মীয়া বাংলাদেশ বিমানে ফ্লাইট সার্ভিসের বিজ্ঞাপন দেখে আমাকে বিমানবালা (এয়ার হোস্টেস) হিসেবে চাকরি করার পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন যে এ কাজটি করতে পারলে আর্থিক দিকসহ সবদিক থেকে আমি উপকৃত হব। নানা দেশ ও দেশের মানুষের সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমে দেখাশোনার গণ্ডি বাড়বে ও তা বেঁচে থাকতে প্রেরণা যোগাবে। কথাটায় যুক্তি আছে দেখে বিমানের চাকরিতে যোগ দিলাম ও দেখলাম সত্যি সত্যিই আমার জীবনের গতি আলোর দিকে মোড় নিচ্ছে। এ জন্যে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তবে চাকরিটা সহজ ছিল না। কারণ মাসের মধ্যে বিশ-বাইশ দিনই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সময়-অঞ্চলে (টাইম জোন) থাকা, বায়ুমণ্ডলের অনেক উঁচু স্তর দিয়ে যাতায়াত করা যেখানে প্রাকৃতিক অক্সিজেন প্রায় নেই বলে জাহাজের কৃত্রিম আলোবাতাসে দিনের পর দিন কাজ চালিয়ে যাওয়া, একেক দেশের আবহাওয়া ও তাপমাত্রাগত পার্থক্য মোকাবিলা করা ও রাত্রি জাগা– এসব ছিল নিত্যসঙ্গী।

কিন্তু ভাগ্য কি আর এড়ানো যায়! মায়ের মৃত্যুর সাড়ে তিন বছর পরে বাবাও মারা গেলেন, হঠাৎ স্ট্রোক করে। আমরা একেবারেই অভিভাবকহীন হয়ে পড়লাম। কিন্তু ঢাকার মগবাজারে আমাদের ১২ কাঠা জমি ও একটি একতলা বাড়ি থাকায় কিছু লোভী আত্মীয়-অনাত্মীয় মানুষ অভিভাবকের ছদ্মবেশে সামনে এসে দাঁড়াল। তারা নানাভাবে আমার ভাইবোনদের মধ্যে লোভ আর অনৈক্যের বীজ বুনতে থাকল। চাকরির জন্যে সংসারের অনেক বিষয়ই আমার পক্ষে সরাসরি দেখাশোনা করা সম্ভব হত না এবং এ সুযোগটাই তারা নিয়েছিল।

আমার বিয়ের পরে আমার স্বামী মসিহ্উদ্দিন শাকের, স্থপতি ও চিত্রপরিচালক (*সূর্য দীঘল বাড়ী*), সবার অভিভাবক হিসেবে এ বাসায় থাকা শুরু করলে তাঁর বিরুদ্ধেও শুরু হল নানা ষড়যন্ত্র। এসবের সঙ্গে কয়েকটি ভাইবোনের নির্বুদ্ধিতা, স্বার্থপরতা ও অকৃতজ্ঞতা দেখে-শুনে আমরা দু'জনই অসুস্থ হতে লাগলাম। দু'জনেরই হল ডিওডিনাল আলসার ও শাকেরের সেইসঙ্গে আলসারেটিভ কোলাইটিস। অসুখ নিয়েই আমি চাকরিটা চালিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। ১৯৮৩ সালের এপ্রিলে গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে যাওয়ার পথে উড়োজাহাজেই আমার খাদ্যনালীর সেই ক্ষত ফেটে গিয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। অবতরণের পরে আমার অবস্থা শোচনীয় দেখে বিমানবন্দরের ডাক্তাররা বিখ্যাত গ্রিক শল্যচিকিৎসক ও ক্যান্সার গবেষক ডা. নিকোলাস জে. লিগিদাকিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমাকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি লন্ডনের হ্যামারস্মিথ হাসপাতালে চাকরি করতেন এবং প্রতি সপ্তাহান্তে ছুটির দিন দুটোতে এথেন্সে এসে জটিল রোগীদের অপারেশন করতেন। আমার সৌভাগ্য যে, ঐ দিনটি ছিল সেরকম একটি ছুটির দিন। তিনি আমার অবস্থা পরীক্ষা করে বললেন যে, অপারেশন না করা হলে রোগীর মৃত্যু হতে পারে। কিন্তু এথেন্সে কর্মরত বাংলাদেশ বিমানের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বললেন যে, এ অপারেশনের ব্যয়ভার বহনের কোন এখতিয়ার তাঁর নেই। তাঁকে ঢাকার প্রধান কার্যালয় থেকে অনুমতি নিতে হবে, যা কিনা সময়সাপেক্ষ। তখন ডা. নিকো (এ নামেই তিনি বেশি পরিচিত ছিলেন) হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনে আমার চিকিৎসার সমুদয় আনুষঙ্গিক ব্যয় পরিশোধের নিশ্চয়তা দিয়ে অপারেশনটি করেন। একটি গরীব দূরদেশের সামান্য একজন বিমানকর্মীর প্রতি তাঁর এ সহানুভূতির কথা অবশ্য আমি অনেক পরে জেনেছিলাম। তার আগে চিকিৎসার খরচ বাংলাদেশ বিমান থেকেই মিটিয়ে দেয়া হয়েছিল।

কিন্তু এ মহান মানুষটিকে জানার সুযোগ হয়েছিল সেবারেই। অপারেশনের পরে ১৮ দিন হাসপাতালে থাকাকালে তিনি কয়েকবার আমাকে দেখতে এসেছিলেন। এর মধ্যে ১০ দিন আমাকে স্যালাইন ইঞ্জেকশন দিয়ে রাখা হয়েছিল। পেটের ময়লা পরিষ্কার করতে নাকের ভেতর দিয়ে নল ঢুকানো ছিল। খুব কষ্ট হত। তাই ডা. নিকোকে দেখলেই আমি কাতরস্বরে বলতাম, 'আমার খুব কষ্ট হচ্ছে! আমি আর হাসপাতালে থাকতে চাই না। নাকের নল খুলে দিয়ে আমাকে ছেড়ে দিন।' তিনি আমার এ অযৌক্তিক আবদারে বিরক্ত না হয়ে এমনভাবে কথা বলতেন যে আমি তখনকার মত সব কষ্ট ভুলে যেতাম। তাঁর স্নেহের স্পর্শে মা-বাবা হারাবার ব্যথাও যেন কমে যেত। আসলেই তিনি ছিলেন আমার বাবার বয়সী এবং নিঃসন্তান। হয়তো তাই তাঁর মধ্যে প্রচ্ছন্ন এক পিতৃস্নেহ অনুভব করতাম।

ডা. নিকোর বাড়িতে তাঁর নিজস্ব একটা ক্লিনিক ছিল। আমার অপারেশনের আগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে ওখানেই আমাকে পাঠানো হয়েছিল। তখন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়। অপারেশনের পরে হাসপাতালে থাকার সময়ে সপ্তাহের দিনগুলোতে যখন ডা. নিকো দেশে থাকতেন না, তখন ইংরেজি-না-জানা গ্রিক নার্সদেরকে কোন কথা বোঝাতে না পারলে আমি মিসেস নিকোকে ফোনে তা জানাতাম এবং তিনি তা নার্সকে বুঝিয়ে বলতেন। হাসপাতাল ছাড়ার পরে ৬ দিন হোটেলে বিশ্রাম নিয়েছিলাম। ডা. নিকো সেখানেও আমাকে দেখতে এসেছিলেন। তারপর আমাকে দেশে ফেরার অনুমতি দেয়ার সময়ে বলেছিলেন, 'তোমার অন্ত্রে ৪/৫টি পলিপ (অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, যা কখনো কখনো ক্যান্সারধর্মী টিউমারের আকার নেয়) আছে যেগুলো মাস ছয়েকের মধ্যে কেটে ফেলে দিতে হবে। কারণ এগুলো থেকে ক্যান্সার হতে পারে। তোমার অবস্থা খারাপ ছিল বলে দুটো অপারেশন একসঙ্গে করা যায়নি।'

এ কথা শুনে আমার মনে যে দুশ্চিন্তা হয়েছিল তা তিনি বুঝতে পেরে আমাকে অভয় দিয়ে ভাল থাকার জন্যে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন, যে কারণে তিনি আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি বলেছিলেন,

২০১৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ডা. নিকো প্রায় নব্বই বছর বয়সে মারা যান। অদ্ভুত ব্যাপার যে, ঐ সময়টায় প্রায়ই তাঁর কথা আমার মনে পড়ছিল, কিন্তু তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কারণ তাঁর পুরনো ফোন নম্বর এখন নেই।

'দুশ্চিন্তা করে কোন লাভ হবে না, বরং বাঁচতে চাইলে তোমার নিজেকেই নিজের ডাক্তার হতে হবে। জানতে হবে শরীর কী, খাদ্য কী, অখাদ্য কী, অসুখ কী এবং অসুস্থ না হওয়ার জন্যে কী করতে হবে। নইলে আরও কঠিন অসুখ হলে বিশ্ববিখ্যাত পঁচিশজন ডাক্তারও তোমাকে সারাতে পারবেন না।' তাঁর কথা থেকে আমি যা বুঝেছিলাম তা হচ্ছে স্বাস্থ্য বিষয়ে অজ্ঞতা ঘুচিয়ে আমাকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হতে হবে যাতে রোগকে প্রতিরোধ করা যায়। একজন ডাক্তারের কাছ থেকে কোন রোগী এর চেয়ে ভাল পরামর্শ আর কী পেতে পারে?

ঢাকায় ৭ মাস ছুটিতে থেকে বিশ্রাম নিয়ে কাজে যোগ দিয়ে প্রথম এথেন্স ফ্লাইটে গিয়ে আমি ডা. নিকোর সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমাকে বলেন, 'তোমার মূল সমস্যাটি হচ্ছে আবেগগত। তাই বিরূপ পরিবেশে তোমার মধ্যে যে-টেনশন জন্ম নেয় তা থেকে মুক্তি পেতে হবে। এ জন্যে সব সময়ে সুস্বাস্থ্যের তিনটি খুঁটির কথা মনে রাখবে। এক. দুশ্চিন্তামুক্ত থাকার জন্যে যোগ ব্যায়ামের কিছু নিয়ম অনুসরণ করবে যা বই পড়েই জানা যায়। দুই. দৈহিক ও মানসিক সক্ষমতা বাড়াতে যোগ ব্যায়ামসহ অন্যান্য ব্যায়ামও যথাসাধ্য করবে। তিন. সুষম প্রাকৃতিক খাবার খাবে। তোমাদের দেশের অতিরিক্ত তেল-মশলাযুক্ত খাবার খুবই অস্বাস্থ্যকর। তাই তুমি এখন থেকে রান্না বলতে শুধু সেদ্ধ খাবার খাবে। খাওয়ার জন্যে বাঁচার কোন মানে নেই, বাঁচার জন্যে খেতে হয়।'

ইতোমধ্যে আমার স্বামীরও ধরা পড়েছিল আরেক কঠিন অসুখ, আলসারেটিভ কোলাইটিস, যে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এ অসুখটাও কখনো কোলোন ক্যান্সারে রূপ নিতে পারে। ঢাকার চিকিৎসকগণ অপারেশন করাতে পরামর্শ দিয়েছেন যা কিনা খুব জটিল। এ জন্যে রোগী ভয় পায় এবং ওষুধের ওপরই নির্ভর করতে চায়। আমি বিষয়টি ডা. নিকোকে জানিয়ে বললাম, 'আমি আর এত কিছু সামাল দিতে পারছি না। ভাবছি চাকরিটা ছেড়ে দেব।' তিনি বললেন, 'চাকরি ছেড়ো না, বাঁচতে শেখো। জীবন কখনো ঝামেলাবিহীন নয়। একে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখো। স্বাস্থ্যবিধি মেনে তোমরা জীবনযাত্রার ধরন পাল্টে আরও সহজ করে ফেল এবং তোমার স্বামীকেও এ পথে নিয়ে এসো। স্বাস্থ্য বিষয়ক বইপত্র পড়ে দেখবে, বিশেষ করে বিকল্প চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা কী বলেছেন। তা ছাড়া রেডিও-টেলিভিশনে এরকম আলোচনা হলে মনোযোগ দিয়ে শুনে সেই অনুযায়ী তোমরা চলার অভ্যাস করবে। এতে যদি দেখ তোমার স্বামীর অবস্থার কোন উন্নতি হচ্ছে না, তাহলে তখন অপারেশনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে বইকি।'

আমি ডা. নিকোর কথাগুলো মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে তা মেনে যা ফল পেয়েছি তা হচ্ছে আমার দ্বিতীয় অপারেশনটি করতে হয়নি এবং আমার স্বামীও ৩২ বছর ধরে তাঁর অসুখটি অপারেশন ছাড়াই নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। তার ওপর আমি শুধু যে চাকরিটা তখন ছাড়িনি তা-ই নয়, ওটা আরও ২৪ বছর চালিয়ে গিয়েছি। অবশ্য মোট ৩০ বছর চাকরির পরে আরও ৬ বছর মেয়াদ থাকতেই ঢাকা বিমানবন্দরের এক পিচ্ছিল টয়লেটে পড়ে গিয়ে কোমরের হাড় ভেঙে চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছিলাম। তবে এখন আমার চলাফেরায় তেমন কোন অসুবিধা হয় না। সুস্থ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত বলেই আবার ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছি।

সুতরাং আমি আজ জোরের সঙ্গে বলতে পারি এসব নিয়ম মেনে চললে শুধু যে সুস্থ থাকা যায় তা-ই নয়, আর্থিক দিক থেকেও লাভবান হওয়া যায়। প্রথমত অস্বাস্থ্যকর খাদ্য ও পানীয়ের পেছনে এবং দ্বিতীয়ত চিকিৎসার পেছনে টাকা খরচ হয় না। তৃতীয়ত কর্মক্ষম মানুষকে অসুস্থ হয়ে কাজ কামাই তো করতেই হয় না, বরং রোজগারের জন্যে আরও খাটা যায়।

এ কথাগুলো সবার কাছে পৌঁছে দিতে 'সুস্থ হোন, সুস্থ থাকুন' শিরোনামের পরামর্শপত্রটি মেনে চলে অনেকেই ভাল আছেন বলে আমাকে প্রতিনিয়তই জানিয়ে থাকেন। মানুষের শাক-সবজি ও ফলমূল খাওয়ার অভ্যাসের প্রভাব গত কয়েক বছরে বাজারেও পড়েছে বলে মনে হয়। একটু কম পড়াশোনা জানা বয়স্ক লোক ও কিশোর শিক্ষার্থীদের জন্যে ঐ পরামর্শপত্রটির একটি সহজ ও সচিত্র সংস্করণ 'স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল' ২০০৮ সাল থেকে দেয়া হচ্ছে। তবে সাধারণ জনগণের স্বাস্থ্যসচেতনতা বাড়াতে এটুকু যথেষ্ট পদক্ষেপ নয়। এ জন্যে অনেককেই এগিয়ে আসতে হবে। এ উদ্দেশ্যে ২০১১ সাল থেকে একটি স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানও আমরা শুরু করেছি যার নাম 'Healthy Energetic Active Life' (সুস্থ সবল কর্মময় জীবন) এবং এর আদ্যাক্ষরগুলো মিলে হয় HEAL (হীল্) যার অর্থ নিরাময়।

এ সবই করা সম্ভব হয়েছে ডা. নিকোর উপদেশ ও অনুপ্রেরণাকে অবলম্বন করে। তাঁর কাছে তাই কেবল আমি আর আমার পরিবারের সদস্যরাই ঋণী নই, আমার এ পরামর্শপত্রগুলো মেনে চলে যাঁরা ভাল আছেন তাঁরাও পরোক্ষে সবাই ঋণী। তবে তিনি যে শুধু বাংলাদেশের মানুষকেই ঋণী করেছেন তা নয়, বিশ্ব মানবতার প্রতিও তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক অবদান অনেক। যে জন্যে বিভিন্ন দেশের অনেক সংস্থা থেকে অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ বলছি, ফ্রান্সের অ্যাকাডেমি অফ সার্জারিতে তাঁকে সম্মানসূচক সদস্যপদ দেয়া হয়েছিল এবং পরে তিনি সেদেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'লিজিওন অফ অনার'ও পান।

আরোগ্যলাভের পরে আমি যতবার এথেন্সে গিয়েছি প্রায় প্রতিবারেই মিসেস নিকোর সঙ্গে এবং ডা. নিকো থাকলে তাঁর সঙ্গেও দেখা করেছি। তাঁর সঙ্গে আমার ১২ বছর যোগাযোগ ছিল। তারপর বাংলাদেশ বিমানের এথেন্স ফ্লাইটটি বন্ধ হয়ে যায়। তবে যতদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে বা ফোনে কথা হয়েছে তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, 'তুমি কি নিয়ম-কানুন মেনে চলছ?'

২০১৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ডা. নিকো প্রায় নব্বই বছর বয়সে মারা যান। অদ্ভুত ব্যাপার যে, ঐ সময়টায় প্রায়ই তাঁর কথা আমার মনে পড়ছিল, কিন্তু তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কারণ তাঁর পুরনো ফোন নম্বর এখন নেই। শেষ পর্যন্ত এপ্রিল মাসে একজন দক্ষ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সহায়তায় তাঁর বর্তমান ফোন নম্বরটি পেয়ে ফোন করাতে তাঁর স্ত্রী তাঁর মৃত্যুর খবরটি জানালেন। তাঁর কণ্ঠ ছিল কান্নাভেজা। আমার মনে পড়ছিল একবার তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'নিকো রোগীদের কাছে ভাল ডাক্তার, সহকর্মীদের কাছে ভাল সহকর্মী, পরিবারের কাছে ভাল সদস্য; তবে তিনি স্বামী হিসেবে সবচেয়ে ভাল।'

ডা. নিকোর কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য, তাই সকলের পক্ষ থেকে আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। আমি চিকিৎসক হতে পারিনি, কাজেই চিকিৎসাবিদ্যার জনক প্রাচীন গ্রিসের বিজ্ঞানী হিপোক্রাতিসের নামে শপথ নেয়ার সুযোগ আমার হয়নি। তবে ডা. নিকোর অনুপ্রেরণায় আমি যথাসাধ্য সকলের কল্যাণের শপথ নিয়েছি। তাই আমার কাছে ডা. নিকোলাস জে. লিগিদাকিস হয়ে থাকবেন এ যুগের গ্রিসের হিপ্রোক্রাতিস।

জেবুন নেসা
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হীল্

সৌহার্দ

ভারতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

ভারত সরকার প্রত্যেক বছরে ভারতীয় কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা (ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন-আইটিইসি) কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রস্তাব দিচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ৫০টি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে এসব স্বল্পমেয়াদী কোর্সের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বিষয় যেমন– একাউন্টিং, টেলিযোগাযোগ, ইংরেজি, ব্যবস্থাপনা, গ্রামোন্নয়ন ও অন্যান্য বিশেষায়িত কারিগরি কোর্স। ভারত সরকার ৩-৬ মাসের সংক্ষিপ্ত ও মাঝারি মেয়াদি এসব কোর্সের ব্যয়ভার বহন করে।

যোগ্যতা

আবেদনকারীর বয়স ২৫-৪৫ বছরের মধ্যে হবে এবং সরকারি-বেসরকারি বিশেষায়িত কোর্সের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, স্বনামধন্য কর্পোরেট হাউস বা বাণিজ্যিক সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিবর্গ এ কোর্সে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। ইংরেজির ব্যবহারিক জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

কিভাবে আবেদন করবেন

আইটিইসি-র যে-কোন কোর্সে আবেদন করতে হলে আবেদনকারীকে আইটিইসি-র https://itecgoi.in পোর্টালে গিয়ে নিজস্ব লগইন ও পাসওয়ার্ড তৈরি করে নিজেদের নাম রেজিস্টার করতে হবে। তারপর অনলাইনে মনোনীত কোর্সে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর আবেদনকারী ফরম ডাউনলোড করে আবেদনপত্রটি হাইকমিশন অফ ইন্ডিয়া, ঢাকা-য় ফরওয়ার্ড করবেন।

সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিকে অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশসহ আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। কোর্সের বিস্তারিত বিবরণ এবং আবেদনপত্র নিম্নলিখিত লিঙ্ক থেকে পাওয়া যাবে:- http://itec.mea.gov.in লিঙ্কগুলো ভারতীয় হাই কমিশনের ওয়েবসাইট www.hcidhaka.gov.in-এর Education & Training সেকশনেও পাওয়া যাচ্ছে। যে কোন তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন: fshoc@hcidhaka.gov.in এবং commerce@hcidhaka.gov.in

Training Programme in India

The Government of India offers the training courses under the India Technical and Economic Cooperation (ITEC) programme every year. The courses include diverse subjects such as Accounting, Telecommunication, English, Management, Rural Development and other specialized technical courses in over 50 reputed Institutions across India. These are short and medium term courses of between 3-6 months duration and are completely sponsored by the Government of India.

Eligibility

The applicants must be between 25-45 years of age and should have 5 yearsÕ relevant work experience in the area of specialized course in either Government or in a private organisation. They may belong to Government, Universities, reputed corporate houses or trade bodies. Working knowledge of English is essential.

How to apply

To apply for any ITEC course, the applicant must visit ITEC portal at https://itecgoi.in and register himself/herself by creating their own login and password. Thereafter, apply for the selected course online. After submitting the application form, the selected course online. After submitting the application form, the applicant should download the form and forward the application to the High Commission of India, Dhaka along with a letter of recommendation from the parent organisation of the applicant. Applicants working in the Government must approach the Economic Relations Division (ERD), Ministry of Finance or the Ministry of Foreign Affairs of the Government of Bangladesh for recommending the applications.

The details of courses on offer for the year and application forms can be downloaded at the following links :-

http://itec.mea.gov.in

The links are also available at the website of the High Commission of India at www.hcidhaka.gov.in under the Education & Training section.

Any queries may be addressed to fshoc@hcidhaka.gov.in & commerce@hcidhaka.gov.in

দ্বিজেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিকৃতি *স্বপ্ন-প্রয়াণ*। একটি রূপক কাব্য। বাংলা সাহিত্যে এর তুলনা নেই। এর প্রকাশকাল ১৮৭৫। তখন কবির বয়স পঁয়ত্রিশ। কিন্তু এ সময় তিনি ডুবে আছেন দর্শন ও Metaphysics-এ। তাঁর চার খণ্ড বহুখ্যাত তাত্ত্বিক দার্শনিক গ্রন্থ 'তত্ত্ববিদ্যা' (Ontology) ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়ে গেছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বয়ং জানিয়েছেন, সে-সময়ে তিনি তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় মশগুল ছিলেন বলে এই কাব্যে Metaphysics ঢুকেছে। অবশ্যই ঢুকেছে! দ্বিজেন্দ্রনাথের পক্ষে তখন এটাই ছিল স্বাভাবিক। ফলে তাঁর দর্শনের অমূর্ত ভাবনা তিনি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন *স্বপ্ন-প্রয়াণ* কাব্যের আশ্চর্য রূপকের মাধ্যমে।

প্রবন্ধ

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭৬তম জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি

ড. নরেশচন্দ্র সাহা

এ তথ্য আমাদের অজ্ঞাত নয় যে, উনিশ শতকের 'রেনেসাঁ'- এর আশ্চর্য বিস্ফার ও উদ্ভাসনের পরিমণ্ডলে বাঙালির মনন ও চেতনায়– সংস্কৃতি ও সংস্কারের পটভূমিতে– ঐতিহ্য ও আধুনিকতার বিরোধ ও সমন্বয়ে যে-গৌরববময় ইতিহাস গড়ে উঠেছিল সেদিন, তাতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনন্য সাধারণ ভূমিকাটি সশ্রদ্ধ মহিমায় মহিমান্বিত। এ কথাও অবশ্য সত্যি যে, সে-দিনের সমকাল ও সমকালীন প্রতিবেশে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির সামগ্রিক আবহাওয়া ও অন্দরমহলের নিজস্ব পরিবেশিত ছিল দুর্লভ এবং আশ্চর্য এক ব্যতিক্রম। আবার এই বিশিষ্ট পরিবারের অভ্যন্তরেই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তুলনারহিত অন্যতর আরেক ব্যতিক্রান্ত পুরুষ।

কলকাতার জোড়াসাঁকোর ইতিহাস-ধন্য ঠাকুরবাড়ির পত্তনকারী প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের (১৭৯৪-১৮৪৬) পৌত্র ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ। তাঁর জন্ম ১৮৪০-এর ১১ মার্চ। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বয়স তখন তেইশ। কনিষ্ঠ-অনুজ, বিশ্বখ্যাত রবীন্দ্রনাথের জন্ম এর একুশ বছর পরে (১৮৬১)। সময়গত অবস্থানে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাই একদিকে দেবেন্দ্রনাথ ও অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রায় সমদূরবর্তী।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ও জীবনী পর্যালোচনা করলে তাঁর বহুমুখী প্রতিভা আমাদের বিস্মিত করে।তাঁর ছিল মানসিকতার নানা মহলের বিপুল ঐশ্বর্য। বস্তুত তাঁর প্রতিভার বৈচিত্র, বিষয়-অধিকারে ব্যাপ্তি ও গভীরতা প্রবাদপ্রতিম। দর্শন - কাব্য - গদ্য - ব্যাকরণ - পরিভাষা - উপসর্গ বিচার -অনুবাদ - ইউক্লিড - ক্রটিমুক্ত জ্যামিতি ভাবনা– বিজ্ঞান ও চিত্রবিদ্যার সঙ্গে বক্সোমেট্রি, বাংলা শর্টহ্যান্ড লিপি প্রবর্তনা ও সংগীত স্বরলিপির উদ্ভাবন এবং তার সঙ্গে

ভারতী ও *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকার মত উনিশ শতকের অতি প্রসিদ্ধ দুটি পত্রিকার সুদক্ষ সম্পাদনা, আদি ব্রাহ্মসমাজ ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মত বিশিষ্ট সারস্বত প্রতিষ্ঠান, স্বদেশী মেলা ও অন্যান্য নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আজীবন ওতপ্রোত সংযুক্তি– এ সবই তাঁর বর্ণময় প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন।

সেই যুগে দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন সকলের কাছেই পরম শ্রদ্ধেয়। মহাত্মা গান্ধী শান্তি নিকেতনে এসে বসেন তাঁর পায়ের কাছে এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের সামনে তাঁর 'মহাত্মা' পদবি নামিয়ে (`Shed') রাখতে চান অবলীলায়। সমকালীন প্রাজ্ঞ-জ্ঞানী-গুণীদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ পণ্ডিতকুল-চূড়ামণি। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে 'বিজ্ঞ, গম্ভীর এবং ভাবুক' বলে অভিহিত করেন। কবি মধুসূদন দ্বিজেন্দ্রনাথের *মেঘদূত* কাব্যানুবাদে গভীরভাবে প্রভাবিত হন এবং নিজে বাংলা কাব্যরচনায় আগ্রহী হন। সেদিনের বিদ্বজ্জনেরা উন্মুখ হয়ে থাকেন বিভিন্ন বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষণ শোনার জন্য। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে গান্ধীজিসহ প্রায় সকলেই তাঁকে 'বড়দাদা' বলে ডাকেন। বন্ধু ও অনুরাগীদের সঙ্গে তাঁর প্রাণখোলা পরিহাসপ্রিয়তা ও অকৃত্রিম অট্টহাস্য তো সর্বজনবিদিত। শুধু বিদ্বান-বিদগ্ধজনেরাই নয়, সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ, এমনকি পশু-পাখিদের সঙ্গেও তাঁর অবাধ মেলামেশা ও সুগভীর সখ্য। উপরন্তু তাঁর বিস্ময়কর বর্ণময় প্রতিভা ও বিরল পাণ্ডিত্যের পাশাপাশি প্রাত্যহিক জীবনচর্যায় তাঁর আত্মভোলা সাধুপ্রতিম স্বভাবটিও ছিল অতুলনীয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনকালে নানা কর্মকাণ্ড, বিচিত্র সৃজনধারা ও মননপ্রবাহের প্রতি সুগভীর অন্তর্বীক্ষণে বোঝা যায়, তিনি এত বৈচিত্র্যময় প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কোন বিষয়ে খুব বেশি দিন লেগে থাকেননি তেমন করে। বহুমুখী সৃজনশীলতা ও গভীর কৌতূহল থাকলেও যথার্থ ' গৃহিণীপনা'-র অভাবই হয়তো এর জন্য দায়ী। তাছাড়া তার নিজস্ব স্বভাবটিও ছিল একটু ব্যতিক্রমী। এই জাগতিক সংসারে আত্ম-প্রচার, প্রশংসাও সম্মান প্রাপ্তি– ইত্যাদির প্রতি তাঁর তেমন কোনও আকর্ষণ ছিল না; বরং স্বভাবতই এ-সবে ছিলেন তিনি উদাসীন। আসলে, 'জমীনদারী' নয়– 'আসমানদারী'-ই তাঁকে টানত বরাবর। কিন্তু সে যাই হোক, এর মধ্যেও কাব্য-কবিতা এবং জ্যামিতি-বিজ্ঞানবিষয়ক লেখা ও ভাবনা-চিন্তা নিয়ে কাটিয়েছেন অনেকদিন। আর যে বিষয়ের উপর তাঁর চিন্তা এবং সৃষ্টি চলেছে সারাজীবন ধরে তা হল– দর্শন ও দার্শনিকতা– এবং তা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনেই।

বস্তুত প্রাণচঞ্চল এই জগৎ জীবনের অনন্ত রহস্যই তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে দর্শনের দিকে। অন্যদিকে তাঁর দর্শন-ভাবনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ– 'জ্ঞান'-এর অশেষ রহস্য ও তাৎপর্য বুঝতে গিয়ে, বিশ্বময় পরিব্যপ্ত এই ভৌত জগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিয়ম-শৃঙ্খলাগুলি অনুধাবন করবার প্রয়োজনে বিজ্ঞানের প্রতি হয়ে উঠেছেন পরম শ্রদ্ধাশীল ও অকৃত্রিম অনুরাগী। আবার তাঁর দার্শনিকতার বিমূর্ত ভাবনা মূর্ত হয়ে উঠেছে আপন কাব্যের রূপকতায়। ফলে, দর্শন ও দার্শনিকতার সঙ্গে কাব্যসৃজন ও বিজ্ঞান ভাবনার সম্মিলিত রূপ ও চেতানার মধ্যেই তাঁর মূল প্রতিভার বিকাশ ও পরিণতি লক্ষ্যণীয়। এবার দ্বিজেন্দ্রনাথের সৃজন ও মননের নানা মহলের সামান্য পরিচয় নেবার প্রয়াসী হব আমরা। রবীন্দ্রনাথের জন্মের আগেই, মাত্র সতের বছর বয়সে (১৮৫৭) মহাকবি কালিদাসের সংস্কৃত *মেঘদূত*-এর কাব্যানুবাদ করে সুকবি হিসেবে স্বীকৃতি পান দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং তিনিই সর্বপ্রথম কাব্যে *মেঘদূত*-এর বাংলা অনুবাদে হাত দেন। আরও স্মরণীয় যে, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের আজীবন *মেঘদূত*-এর প্রতি যে-সুগভীর আকর্ষণ ও অনুরাগ তার মূলে রয়েছে 'বড়দাদা' দ্বিজেন্দ্রনাথের মুখে বাল্যকালে শোনা *মেঘদূত*-এর এই কাব্যানুবাদ। দ্বিজেন্দ্রনাথের এই *মেঘদূত* গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় আরও দু'বছর পরে ১৮৫৯-এ। তখন বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের যুগ সন্ধিক্ষণ। কবি মধুসূদন তখন ইংরেজিতে কবিতা লিখতেন। কিন্তু স্বয়ং মধুসূদন দ্বিজেন্দ্রনাথের *মেঘদূত* পাঠ করে সপ্রশংস মন্তব্য করেছেন যে, তাঁর ধারণা ছিল বাংলায় ভাল কাব্য রচিত হতে পারে না; কিন্তু মেঘদূত পড়েই তিনি বুঝতে পারেন তাঁর সে-ধারণা ভুল। কবি মধুসূদন এই কাব্যানুবাদ প্রসঙ্গে এতই আগ্রহান্বিত হন যে, রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত এক চিঠিতে *মেঘদূত*-এর এই অনুবাদক কবিকে 'Good Poet' বলে উল্লেখ করেন। তাছাড়া তৎকালীন বিদ্বজ্জন সমাজ এই কাব্যকে সাদরে বরণ করে নেন।

১৯১৫ ॥ নাইটহুড প্রাপ্তির পর কলকাতায় বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

এই অনুবাদ ছন্দোবন্ধের দিক থেকে সংস্কৃত মন্দাক্রান্তার অনুরূপ না হলেও এতে যে উৎকৃষ্ট লিরিক স্বাদ পরিবেশিত হয়েছে, তা সে-যুগের পক্ষে সত্যি বিরল এবং কাব্যের অনবদ্য প্রসাদগুণে গীতিকাব্যের স্বাদে-সৌরভে পঙ্‌ক্তিগুলি আজও পরম উপভোগ্য। সামান্য একটু নমুনা দেখা যেতে পারে;

'প্রেয়সীর ঠাঁই
কুশল সংবাদ মোর কেমনে পাঠাই?
মেঘে দিয়া হেন কার্য্য করিব সাধন
এতেক করিতে মনে আইল শ্রাবণ ॥'
–(পূর্ব-মেঘ)

কিংবা
'শিখী যেথা কেকা ভাষী, সন্ধ্যাকালে বসে আসি,
আনন্দেতে উঁচা করি ঘাড়।
তাহারে নাচায় প্রিয়া, করতালি দিয়া দিয়া
রণ রণ বাজে তার বালা।
স্মরিতে সে-সব কথা, মরমে জনমে ব্যথা,
জ্বলি উঠে হৃদয়ের জ্বালা ॥'
–(উত্তর-মেঘ)

দ্বিজেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিকৃতি *স্বপ্ন-প্রয়াণ*। একটি রূপক কাব্য। বাংলা সাহিত্যে এর তুলনা নেই। এর প্রকাশকাল ১৮৭৫। তখন কবির বয়স পঁয়ত্রিশ। কিন্তু এ সময় তিনি ডুবে আছেন দর্শন ও Metaphysics-এ। তাঁর চার খণ্ড বহুখ্যাত তাত্ত্বিক দার্শনিক গ্রন্থ 'তত্ত্ববিদ্যা' (Ontology) ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়ে গেছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বয়ং জানিয়েছেন, সে-সময়ে তিনি তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় মশগুল ছিলেন বলে এই কাব্যে Metaphysics ঢুকেছে। অবশ্যই ঢুকেছে! দ্বিজেন্দ্রনাথের পক্ষে তখন এটাই ছিল স্বাভাবিক। ফলে তাঁর দর্শনের অমূর্ত ভাবনা তিনি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন *স্বপ্ন-প্রয়াণ* কাব্যের আশ্চর্য রূপকের মাধ্যমে।

স্বপ্ন-প্রয়াণ কাব্য প্রসঙ্গে তৎকালীন পণ্ডিত সমাজ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগের সাহিত্য-বিশারদগণ– প্রত্যেকেই ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর *জীবনস্মৃতি* ও *ছেলেবেলা* দুটি গ্রন্থেই এর কথা বিশেষভাবে বলেছেন গভীর শ্রদ্ধায় ও সমীহে। এই কাব্য রচনাকালে কিশোর রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের মায়া-মোহে, স্বপ্নে-রূপকে, ধ্বনিতে-ছন্দে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ *জীবনস্মৃতিতে* জানাচ্ছেন, 'আমরা এই কাব্যের রচনা ও আলোচনার হাওয়ার মধ্যেই ছিলাম। তাই ইহার সৌন্দর্য

সহজেই আমাদের হৃদয়ের তন্তুতে তন্তুতে জড়িত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই কাব্য আমার অনুকরণের অতীত ছিল।' রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যকে আরও বলেছেন– 'রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ'। আসলে এই কাব্যখানি নানাদিক দিয়েই অসাধারণ। কাহিনিটি তত্ত্ব ও রূপকের সংমিশ্রণে নিঃসন্দেহে অপরূপ। এর রচনারীতি, সাজ-সজ্জা ও ভাষা ব্যবহারের কৌশল– সবই অভিনব। সংস্কৃত ছন্দ ভেঙে বাংলা ছন্দ সৃষ্টি ও তার যথ যথ ব্যবহারের বৈচিত্র্য ও মাধুর্য বিস্ময়কর। কবি মধুসূদর দত্তর বিখ্যাত *মেঘনাদবধ* কাব্য ইতোমধ্যে সৃষ্টি হয়ে গেছে। ফলে মধুসূদনের সুগভীর প্রভাব ও অনুসারী-অনুকারী তখন সাহিত্য ক্ষেত্রে সর্বত্র। ব্যতিক্রম অবশ্যই দ্বিজেন্দ্রনাথ। মধুসূদন অনুসারী মহাকাব্য কিংবা অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনা যখন প্রায় যুগপ্রচলিত রীতি, সেই সময় এই উভয় রীতিই পরিহার করে এক অপরূপ রূপক কাব্য *স্বপ্ন-প্রয়াণ* রচনা করে নিজের কালজয়ী কাব্য প্রতিভার নিদর্শন রেখেছেন তিনি।

এবার এই কাব্যের রূপকের কথা একটু ভাবা যেতে পারে। আসলে এই কাব্যের রূপক কবির একটি অন্তরঙ্গ তত্ত্বের আবরণমাত্র। কবি এখানে মনোরাজ্য ভ্রমণ করেছেন। হর্ষ-বিলাস-বিষাদ-উদ্যম-দ্বেষ-শান্তি ইত্যাদি মানব মনেরই বিচিত্র অবস্থা এবং এগুলিকেই কাব্যের চরিত্র হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছে। এই কাব্যের রূপকের মাধ্যমে কবি মানুষকে পরম আশাবাদের কথাই শুনিয়েছেন। এখানে রয়েছে মানব জীবনকে অবিরাম সংগ্রাম ও যত্নে আত্মকর্ষণের মাধ্যমে মুক্তিরূপ সোনা ফলাবার আশ্বাস।

এ জীবনে মানুষ আনন্দলাভ করতে চায়; কিন্তু ভোগ-লালসার বশবর্তী হয়ে আনন্দলোক হতে তার বিচ্যুতি ঘটে এবং ক্রমশ বিষাদের, জড়ত্বের, রোগব্যাধি ও সর্বনাশের মুখে পতিত হয়। তারপর সুদীর্ঘ আত্মিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মনের পশু-প্রবৃত্তিসমূহের উচ্ছেদ ও আত্মার উদ্ধার এবং পরিশেষে শান্তি ও আনন্দ লাভ। সাতটি সর্গে সমাপ্ত কাব্যের শেষ সর্গ 'শান্তি-প্রয়াণ'। কাব্যের পরিসমাপ্তি যখন হচ্ছে শান্তি-প্রয়াণে এসে, তখন মানুষ সংগ্রামসফল, বন্ধনমুক্ত ও আনন্দময়।

স্বপ্ন-প্রয়াণ সর্বতোভাবেই একটি মনোজগতের রূপক কাব্য। আর এই রূপকত্বের জন্যই সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ এই কাব্যখানিকে এডমন্ড *স্পেনসারের* (১৫৫২-'৯৯) *ফেয়ারি কুইন* ও জন ব্যানিয়ানের (১৬২৮-'৮৮) *পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস*-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং এদের গঠন ও ভাবগত সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের কথাও বলেছেন। এই দুইখানি গ্রন্থই ইংরেজিতে। প্রথমটি পদ্যে ও দ্বিতীয়টি গদ্যে। সমালোচকদের আবার কেউ-বা *স্বপ্ন-প্রয়াণকে* মহামতি দান্তের (১২৬৫-১৩২১) *ডিভাইন কমেডির* সঙ্গেও তুলনা করেছেন। শুধু বিদেশি গ্রন্থই নয়, সাহিত্য সমালোচকেরা *স্বপ্ন প্রয়াণের* সঙ্গে তুলনায় মনে করেছেন এ দেশীয় একটি দৃশ্যকাব্য, সংস্কৃত ভাষায় লেখা, একাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে রচিত শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের *প্রবোধচন্দ্রোদয়* এবং এরই ঈশ্বর গুপ্তকৃত বাংলায় ভাবানুবাদ, ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত *বোধেন্দু বিকাশ*।

সে যাই হোক, কবি দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিভার বিপুল ঐশ্বর্য ও মহৎ কবিত্বশক্তির সুগহন অধিকারই *স্বপ্ন-প্রয়াণ*-এর মত একটি অসাধারণ কাব্য নির্মাণ সম্ভব করেছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ শুধুমাত্র এইরকম সিরিয়াস কাব্য কবিতাই লিখেছেন– তা কিন্তু নয়। নানা ধরনের কাব্য-কবিতা তিনি রচনা করেছেন। এমনকি আখ্যানমূলক একটি কাব্য গ্রন্থও তিনি রচনা করেছেন। নাম– *যৌতুক না কৌতুক*। এই কাব্যটি রবীন্দ্রনাথের পরিণয় উপলক্ষে প্রীতি-উপহার রূপে রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া হালকা রসের কত যে ধাঁধা, ছড়া, চম্পু কবিতা ইত্যাদি লিখেছেন তিনি তার কোন ইয়ত্তা নেই। হালকা রসের কৌতুককাব্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য– *গুম্ফ আক্রমণ কাব্য*। শ্বেতশুভ্র শ্মশ্রুধারী রাজনারায়ণ বসুকে লক্ষ্য করে এ কাব্য রচনা। দ্বিজেন্দ্রনাথের গভীর রসবোধ ও হাস্য-রসিকতায় সমুজ্জ্বল এই কাব্যখানি। একটু নমুনা:

দেখেন না আরশিতে, কি হতেছে গোঁপটিতে?
প্রতিভার উচিত বিধান!
হেন গোঁপ মনোলোভা নিভ নিভ তার শোভা!
আর কি উচিত অবহেলা?
যদি পরামর্শ চান, কলপ শীঘ্রই লাগান!
লাগান কলপ এই বেলা।

দ্বিজেন্দ্রনাথের দর্শন ও দার্শনিকতা প্রসঙ্গে আমরা একটু দৃষ্টি ফেরাব এবার। দর্শন ও দার্শনিকতায় দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর সময়ে ছিলেন প্রকৃতই সর্বজনমান্য পণ্ডিত চূড়ামণি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনেই তাঁর নিরলস অনুসন্ধান, অপরিমেয় অধ্যয়ন, দৃষ্টি ও মননের গভীরতা এবং বিষয়- অধিকারের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য ছিল বিস্ময়কর।

দ্বিজেন্দ্রনাথের দর্শন চিন্তা ও তার প্রকাশের মূলে আরেকটি বাস্তব ঘটনাও উল্লেখযোগ্য। তা হল– তাঁর দর্শনভাবনা কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে স্কুলিংধর্মী হয়ে গড়ে ওঠেনি। ফলে, তাঁর দর্শনচিন্তা নিছক তথ্যভারে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি। দর্শন শাস্ত্রের মূল তত্ত্বগুলি তাঁর নিজস্ব অনুভবে যেভাবে প্রতিভাত হয়েছিল এবং সে-সব তত্ত্বের ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োগ তিনি চেয়েছিলেন যেভাবে, সে-কথাই তিনি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে, অজস্র প্রবন্ধে, অসংখ্য চিঠিপত্রে ও নানা অভিভাষণে প্রাঞ্জল করে তুলে ধরেছেন তাঁর অনায়াস দক্ষতায় ও বাণীভঙ্গির অপরূপ মাধুর্যে।

দর্শনভাবনায় দ্বিজেন্দ্রনাথ এক ব্যতিক্রমধর্মী ভাবুক। বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ববিদ্যা (Ontology) আলোচনায় তিনিই পথিকৃৎ। তাঁর দীপ্র যৌবনে– ছাব্বিশ থেকে উনত্রিশ বছর বয়সে চারখণ্ড তত্ত্ববিদ্যা প্রকাশিত হয়। দর্শন আলোচনায় দ্বিজেন্দ্রনাথ একদিকে ভারতীয় সাংখ্য, বেদান্ত, উপনিষদ প্রভৃতি নিয়ে সুগভীর পর্যালোচনা করেছেন, তেমনি অন্যদিকে, পাশ্চাত্য দর্শনের বিভিন্ন দিক নিয়ে করেছেন চুলচেরা বিশ্লেষণ। বিদেশী দার্শনিকদের মধ্যে জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট তাঁর প্রিয়তম। কান্টের দর্শনের সঙ্গে বেদান্ত দর্শনের তুলনামূলক অসংখ্য জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ লিখেছেন তিনি *প্রবাসী, তত্ত্ববোধিনী, ভারতী* প্রভৃতি পত্রিকায় দিনের পর দিন। এই রকম কয়েকটি প্রবন্ধের শিরোনাম উল্লেখ করছি, যা থেকে কান্ট বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা সহজেই আন্দাজ করা যায়। যেমন: 'কান্টে-বেদান্তে বোঝাপড়া', 'কান্টীয় দর্শনের স্বরূপ বস্তু', 'কান্ট এবং সাংখ্য বেদান্ত', 'কান্টীয় বিজ্ঞান তত্ত্বের ভিত্তিমূল', 'কান্টীয় বিজ্ঞান তত্ত্বের মোট সিদ্ধান্ত' ইত্যাদি। প্রসঙ্গত, পূর্বোল্লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের চারখণ্ড তত্ত্ববিদ্যা লক্ষ্য করলে ইমানুয়েল কান্টের বিশ্বখ্যাত তিনটি ক্রিটিকস্-এর [ক্রিটিক অফ পিওর রিজন, ক্রিটিক অফ প্রাক্টিক্যাল রিজন, ক্রিটিক অফ জাজমেন্ট] কথা মনে পড়ে যায়।

দ্বিজেন্দ্রনাথের দার্শনিক গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য *তত্ত্ববিদ্যা* (৪ খণ্ড), *সাধনা: প্রাচ্য ও প্রতীচ্য*, *অদ্বৈত মতের সমালোচনা*, *ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসাধন*, *বিদ্যা এবং জ্ঞান*, *হারামনির অন্বেষণ*, *গীতাপাঠ*, *নানা চিন্তা*, *চিন্তামণি* ইত্যাদি। এছাড়া আরও অসংখ্য জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। দ্বিজেন্দ্রনাথ দর্শন ও দার্শনিকতার ক্ষেত্রে, একদিকে যেমন তাত্ত্বিক-পণ্ডিত এবং তার্কিক, অন্যদিকে– যুগপৎ, আত্ম-নিবেদনেচ্ছু- মুমুক্ষু অকৃত্রিম এক ভক্তপ্রাণ। বিষয়টি সহজবোধ্য হয় যখন দেখি, ছাব্বিশ বছরের যুবক দ্বিজেন্দ্রনাথ তত্ত্ববিদ্যার মত সুগভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ এক দার্শনিক গ্রন্থে (১ম খণ্ড/জ্ঞান-কাণ্ড) বলেন, 'কেবল বুদ্ধির পরিচালনা করা তত্ত্ববিদ্যার উদ্দেশ্য নহে, মুক্তি সাধনই তত্ত্ববিদ্যার একমাত্র লক্ষ্য।'

ব্যক্তিগত জীবন-চর্যায় তিনি পৌত্তলিকতা যেমন একদিকে মেনে নিতে পারেননি, তেমনি পারেননি নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণা কিংবা উপাস্য-উপাসকের মধ্যে অদ্বৈতভাব ও অভেদ কল্পনাকে মেনে নিতে। দ্বিজেন্দ্রনাথের মতে স-গুণ ব্রহ্মের উপাসনাই প্রকৃত সত্যের পথ। তাঁর জীবনদর্শন ও বিশ্বাসের এই সুরটি তিনি নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করেছেন এইভাবে: 'সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাই মধ্যপথ– তাহাই প্রকৃত সত্যের পথ। পৌত্তলিকতা তাহার একরূপ বিকৃতি এবং শূন্য অদ্বৈতবাদ তাহার আর একরূপ বিকৃতি।'

স্বদেশ ভাবনা ও দেশ হিতৈষণা প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন খাঁটি স্বদেশী। পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাব-ভঙ্গি, ব্যক্তিগত জীবনচর্যা– সবকিছুতেই।

স্বদেশ চেতানার উদ্বোধনলগ্নে ঐতিহাসিক হিন্দুমেলার আয়োজনে তিনি ছিলেন একজন প্রধান বাস্তুকার ও নিয়ামক। এই মেলা উপলক্ষ্যেই রচিত হয় তাঁর স্বদেশী সংগীত– 'মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি'– যা সে যুগে প্রায় জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পেয়েছিল। ১৮৬৭ সালের ১২ এপ্রিল এই মেলার প্রথম অনুষ্ঠান হয়। ওইদিন ছিল বাঙলা ১২৭৩ সালের চৈত্র সংক্রান্তির দিন। তাই প্রথমদিকে এই মেলা চৈত্র মেলা নামেও

পরিচিত ছিল। উল্লেখ্য, এই মেলার প্রথম অনুষ্ঠানেই দ্বিজেন্দ্রনাথের উল্লেখিত স্বদেশী গানটি গেয়েছিলেন কিশোর রবীন্দ্রনাথ।

দ্বিজেন্দ্রনাথের এই স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশী ভাবনা থেকেই উৎসারিত হয় তাঁর দেশ হিতৈষণামূলক অজস্র প্রবন্ধ। এই জাতীয় রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল– 'সোনার বাটি রূপার বাটি', 'সোনায় সোহাগা', 'আর্য্যামি এবং সাহেবিআনা', 'সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা' প্রভৃতি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন মনে-প্রাণে স্বদেশপ্রেমী। দেশের সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উপর ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। অবশ্য এই শ্রদ্ধা যুক্তিবিবর্জিত ভাবলুতাশ্রয়ী ছিল না। যুক্তিহীন ঐতিহ্যমুখিনতা কিংবা নিয়ন্ত্রণহীন উন্মত্ত আধুনিকতা তাঁর নিজস্ব ভাষায় 'আর্য্যামি' এবং 'সাহেবিআনা'– দুটোরই বিরোধী ছিলেন তিনি। কারণ এই দুটোই দেশের পক্ষে অমঙ্গলজনক। তাঁর সামাজিক প্রবন্ধগুলির মধ্যে সর্বত্র এই মননধারাই পরিস্ফুট।

দ্বিজেন্দ্রনাথের এতসব বিচিত্র চিন্তাচেতনার বাহন তাঁর নিজস্ব গদ্য। এ গদ্য রূপে-রসে-ঢঙে অভিনব ও অনন্য। শুধু সে যুগে নয়, আজও। তৎসম ও তদ্ভব শব্দের সঙ্গে দিশি ও লৌকিক শব্দের এমন মানানসই সহাবস্থান, ইডিয়মের ব্যাঞ্জনাময় ব্যবহার তাঁর গদ্যে নতুন মাত্রা এনে দেয়। তাছাড়া বাংলা চলতি গদ্যের সূচনায় তাঁর অসামান্য ভূমিকা লক্ষ্য করবার মত। চলতি গদ্যে স্বনামধন্য প্রমথ চৌধুরীর আদর্শ ও অনুপ্রেরণা ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। বস্তুত বাংলা গদ্যের সৃজনশীলতায় দ্বিজেন্দ্রনাথ এক অসম সাহসী শিল্পী।

জ্যামিতিবিষয়ক প্রবন্ধাবলি দ্বিজেন্দ্রনাথের এক সুদীর্ঘ মননশীল গবেষণার ফসল। ইউক্লিডের প্রচলিত জ্যামিতিকে ত্রুটিমুক্ত করতে চেয়েছেন তিনি অনবদ্য ভাষায় ও অকাট্য যুক্তিতে। আর এ বিষয়ে নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন দিনের পর দিন *ভারতী*, *প্রবাসী* ইত্যাদি পত্রিকায়। বিজ্ঞান বিষয়ে পৃথক প্রবন্ধ না লিখেও, তাঁর বিভিন্ন দার্শনিক প্রবন্ধের মধ্যেই বিজ্ঞানের সাম্প্রতিকতম জ্ঞান ও ফর্মূলাকে প্রয়োগ করছেন তিনি অনায়াস দক্ষতায় ও যৌক্তিক মুন্সিয়ানায়।

বাংলা উপসর্গ নিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের অনলস গবেষণা ও তার ফলে রচিত *উপসর্গের অর্থ বিচার* গ্রন্থটি এর বিষয়-গৌরবে ও শ্রমনিষ্ঠ প্রজ্ঞায় আমাদের বিস্ময়ে স্তব্ধ করে দেয়। এই গ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিচ্ছি এখানে: 'লেখক আমাদের মান্য গুরুজন সে একটি কারণ বটে, কিন্তু গুরুতর কারণ এই যে, তাহাতে আমাদের মত অধিকাংশ পাঠকের মনে সম্ভ্রম উদয় না হইয়া থাকিতে পারে না।'

পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে, দ্বিজেন্দ্রনাথ এক অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকার মত একটি অতিবিখ্যাত পত্রিকার আর কোনও সম্পাদক এত দীর্ঘকাল ধরে সম্পাদক হিসেবে কাজ করেননি। এ ছাড়া তিনি ছিলেন *ভারতী* পত্রিকার প্রথম সম্পাদক এবং সাত বছর কৃতিত্বের সঙ্গে (১২৮৪-'৯০) এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এই পত্রিকার *ভারতী* নামটিও দ্বিজেন্দ্রনাথেরই দেওয়া।

তত্ত্ববোধিনী ও *ভারতী* পত্রিকার সম্পাদনা ছাড়াও দ্বিজেন্দ্রনাথের নাম আরও দুটি পত্রিকার সঙ্গে জড়িত। এই দু'টি পত্রিকা হল– *হিতবাদী* ও *শ্রেয়সী*। এই দু'টি পত্রিকার নামকরণও দ্বিজেন্দ্রনাথেরই।

এছাড়াও নানা সংগঠন ও সারস্বত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যুক্ততা স্মরণযোগ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন পর পর তিন বছর (১৮৯৭-১৯০০)। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর ছিল আজীবন ঘনিষ্ঠতা। তিনি দীর্ঘদিন এর আচার্য ও পরে আচার্য ও সভাপতির পদ অলংকৃত করেন।

এত ক্রিয়াকাণ্ডের পরেও আরও দু'ট শৌখিন কলা দ্বিজেন্দ্রনাথের মন টেনে নিল। তার একটি– বিনা আঠায় কাগজ কেটে জ্যামিতির ফর্মূলায় বাক্স রচনা প্রণালী (বাক্সোমেট্রি); অন্যটি হল– বাংলায় শর্ট হ্যান্ড লেখার রীতি উদ্ভাবন– যার নাম দিলেন 'রেখাক্ষর বর্ণমালা'। এই দু'টি বিষয়ই পদ্যে রচিত। শর্ট হ্যান্ডের মত একটি টেক্‌নিক্যাল বিষয় পদ্যের মোড়কে কত অনায়াসে ও হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে প্রকাশ করা যায়, তা বইটি না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের আর এক উল্লেখযোগ্য কীর্তি বাংলায় সংগীতের স্বরলিপি প্রবর্তন। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন– 'বাঙ্গালায় প্রথম স্বরলিপি যে আমার রচিত, তাহা একেবারে নিঃসন্দেহ।' বাংলা পরিভাষা সৃষ্টিও দ্বিজেন্দ্রনাথের আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। শুধু সাহিত্যের নয়, বিজ্ঞানের পরিভাষা সৃষ্টি করাতেই ছিল তাঁর প্রধান চেষ্টা।

চিত্রবিদ্যাও একদা ছিল তাঁর আকর্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে। এবং শিখেওছিলেন। এমনকি *ভারতী* পত্রিকা প্রথম বেরোবার সময় তার মলাটের ডিজাইন তিনিই দিয়েছিলেন, যদিও শেষ পর্যন্ত কিছু অসুবিধা দেখা দেওয়ায় মলাটে সেই ডিজাইন ছাপা হয়নি।

দ্বিজেন্দ্রনাথ চিঠিপত্র লেখার আর্টে এক অননুকরণীয় শিল্পী। নানা জনকে লেখা তাঁর শ্রদ্ধা, মনন ও মমতাভরা অজস্র চিঠি পাঠ এক মনোহারী অভিজ্ঞতা। ভাবের প্রেরণায় স্নেহের ছোঁয়ায়, হাসির ছটায়– তাঁর চিঠি সত্যি অনবদ্য। বাংলা পত্র ও পত্রসাহিত্য নির্মাণে দ্বিজেন্দ্রনাথের দান অবশ্য স্মরণীয়।

শান্তিনিকেতনে তিনি ছিলেন সকল প্রাজ্ঞজনদের প্রধান আকর্ষণ। ক্ষিতিমোহন সেন, বিধুশেখর শাস্ত্রী, সি এফ এন্ড্রুজ প্রমুখ গুণিজন তাঁর সান্নিধ্যে ধন্য হতেন। পরবর্তীকালে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁর কাছে যেতেন বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মতামত জানতে। স্যার জন উড্‌রফের সঙ্গে চলত চিঠিপত্রে তাঁর দর্শন প্রসঙ্গে ভাব বিনিময়। গান্ধীজির সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সম্পর্ক।

দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বয়সের পার্থক্য একুশ বছর; তৎকালে পিতা-পুত্রের মত। রবীন্দ্রনাথও তাঁকে পিতার মতই শ্রদ্ধা করতেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠার সাধনায় পিতার পরেই পরিবারে যাঁর প্রভাব সবচেয়ে বেশি, তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথ।

১৮৫৮ সালে আঠারো বছর বয়সে দ্বিজেন্দ্রনাথের পরিণয় সম্পন্ন হয়। পাত্রী যশোহরের তারাচাঁদ চক্রবর্তীর কন্যা সর্বসুন্দরী দেবী। কুড়ি বছরের দাম্পত্য জীবন তাঁদের। মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে দ্বিজেন্দ্রনাথের স্ত্রী বিয়োগ ঘটে। পাঁচপুত্র ও দুই কন্যার জনক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। ছিয়াশি বছর বয়সে ১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি শান্তিনিকেতনেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এতক্ষণ আমরা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্মময় জীবন, মনন ও সৃজনের বিভিন্ন প্রসঙ্গ একটু বিহঙ্গাবলোকনে দেখবার চেষ্ট করলাম। কিন্তু গদ্যে-পদ্যে অজস্র রচনা, অভিভাষণ, নানা কর্মকাণ্ড ইত্যাদি থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথের যে পরিচয় ফুটে ওঠে, তিনি নিজে প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে অনেক বড়। আর এই বড়ত্বের একটি দিশা আমরা পেয়ে যাই জীবনের প্রান্তদেশে সমুপস্থিত উনআশি বছরের রবীন্দ্রনাথের কিছু কথায়। কথাগুলি তিনি বলছিলেন ১৯৪০ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতন মন্দিরে প্রদত্ত অভিভাষণে তাঁর 'বড়দাদা' দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে। এখানে রবীন্দ্রনাথের সেই বক্তব্যের সামান্য উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি:

'চিরদিন বহির্বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন নিরাসক্ত। অন্তর্বিষয়ে ধ্যানপরায়ণ ছিল তাঁর চিত্ত...। একদিকে আত্ম-তত্ত্বের সন্ধানে তাঁর মন ছিল গুহায়িত, অন্যদিকে বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যলোকে তাঁর কবিহৃদয় সর্বত্র পেয়েছে আনন্দ প্রবেশাধিকার; তাঁর নিভৃত অবকাশ ছিল গভীর গবেষণায় অভিনিবিষ্ট, তাঁর লোকসঙ্গ ছিল হাস্যোচ্ছ্বসিত সৌন্দর্যে মুখরিত।... আধ্যাত্মিক সাধনায় তিনি আপন দৈন্যের দিকেই লক্ষ্য করতেন, ঐশ্বর্যের দিকে নয়। সাধকের আত্মাভিমানের দুর্গতি তাঁকে কোনও দিন স্পর্শ করেনি।' রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য দ্বিজেন্দ্রনাথকে যথাযথ বুঝতে ও তাঁর ভাবৈশ্বর্যময় 'গুহায়িত' চিত্তের উন্মোচনে এক জ্যোতির্ময় আলোর দিশারী।

রেনেসাঁ যুগের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'রেনেসাঁম্যান' দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর মত একজন বহুমুখী বর্ণময় প্রতিভা যে-কোন দেশে যে-কোনও কালেই দুর্লভ; তাই বহু আকাঙ্ক্ষিত।

তাঁর জন্মের একশো ছিয়াত্তর বছর অতিক্রান্তিতে আজও তিনি আমাদের প্রণম্য পিতৃপুরুষ।

ড. নরেশচন্দ্র সাহা
ভারতের গবেষক ও প্রাবন্ধিক

অনুবাদ গল্প

ফাঁকি

রাজকিশোর পট্টনায়ক

আটশো টাকা গুণ্ঠ দরে জমি কিনিয়া বাড়ি করার সময়ে বাপে আর ছেলেতে সর্বদা এক কথা– কোথায় বাড়ি হইবে। ছেলে বলে, রাস্তার ধারে করা যাক, তাহলে রাস্তা থেকে নামলেই সহজে বাড়িতে ঢোকা যাবে। বাপ বলেন– এমন মরুভূমির মধ্যে কেউ বাড়ি করে না। চারিদিকে পাথরের মত শক্ত শুকনো মাটি, এর মধ্যে বাড়ি করার মানে কী?

– তাহলে কী করা যায়, বাবা?

– এটুকু জমি খালি রাখা যাক, গাছপালা কিছু–

– হ্যাঁ বাবা, বাগান করব।

– আগে গাছ লাগাব। তার পরে যত বাগান করবে কর।

– কী গাছ?

আম গাছ পুঁতব এইখানে। কলমী গাছ। আমি একটা কলমী গাছ করেছি– বিরিবাটির বাগানে। ভাল আম। সেই যে ভাগলপুর থেকে লেংড়া আম আনিয়েছিলাম– মনে নেই তোর?

গোপাল মুখ তুলিয়া সন্দিগ্ধভাবে বাবার দিকে তাকাইল। বাবা কী কলম করিয়াছিলেন কে জানে। গাছ কি ভাল হইবে? ফুলের বাগান করিলে কী সুন্দর হইত।

– বাবা, ফুলের বাগান করলে ভাল হত না?

– এখানকার মাটি বেলে মাটি। জল দেবারও সুবিধা নেই।

– বাবা আমি জল দেব।

– হ্যাঁ রে হ্যাঁ, তুই তো নিজের হাতে জল তুলে চানটুকুও করতে পারিস না বলে তোর মা চাকর খুঁজছে। তুই করবি বাগান!

– না বাবা।

বেশ করবি তো কর। একটা আম গাছ এখানে থাকবে। তুই যত ফুলগাছ লাগাবি লাগা।

আমের চারা আসিল– ছোট একটি হাঁড়ির মধ্যে। কালে মাটির উপরে একহাত উঁচু আম গাছ। সবশুদ্ধ গণ্ডা আষ্টেক পাতা হইলেও হইতে পারে।

– বল তো রে, কোথায় পোঁতা হবে।

– বাবা, মাধখানে পোঁত। নইলে এর ডালপালা পাঁচিল ডিঙিয়ে বাইরে চলে যাবে, রাস্তার ছেলেরা উৎপাত করবে। গাছের জন্য কোঁন্দল লাগবে, বাইরের কোঁন্দল এসে ঘরে ঢুকবে।

– তোর কেবল ঐসব কথা।

বাপের কথায় রাগ করিয়া গোপাল চলিয়া গেল বাড়ির ভিতর– মায়ের কাছে নালিশ করিতে।

– দেখ্ তো মা, বাবা আম গাছ নিয়ে পাঁচিলের কাছে লাগাচ্ছেন। গাছে আম ফললে পাড়ার ছেলেরা কি আর রাখবে?

– ওগো! আমগাছ ওখানে কেন লাগাচ্ছ? গোপাল এদিকে রাগ করছে।

– ওঃ! তোমার ছেলে কিছু করবে না, খালি– এই আমগাছ হবে, তার ডাল পাঁচিল টপকাবে, রাস্তার ছেলেরা ঝগড়া বাধাবে– এই সব। খুব হয়েছে, মা আর ছেলের একইরকম বুদ্ধি।

– হ্যাঁ, একইরকম বুদ্ধি। ওখানে গাছ লাগানো হবে না।

– আমি বলছি হবে। আমার জমিতে আমি গাছ লাগাব।

– অ্যাঁ, তোমার জমি? জমি আমার। তোমার নামে আছে, না?

– যা পালা বলছি।

মায়ে-পোয়ে ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল, বিশেষ আলোচনার জন্য। –বাবা সব খারাপ করে দিচ্ছেন। বেশ, করুন।

ঝগড়ার ফলে গাছ সরিল– দুই হাত ভিতরের দিকে। জল দেওয়া হইল। জন্তু-জানোয়ার ঠেকাইবার জন্য কঞ্চি দিয়া বেড়াবন্দী করা হইল।

সকালে গোপাল আর গোপালের মা উঠিয়া প্রথমে গেল আমগাছ দেখিতে, গাছ নেতাইয়া পড়ে নাই তো? না, বেশ তাজা আছে।

মাকে গোপাল চুপি চুপি বলিল– গাছটা আর দু' হাত ভিতরে লাগালে কত ভাল হত।

– আচ্ছা এখানেই থাক। বাবা ভারী একগুঁয়ে, কি আর করা যাবে।

– মা, আমি কিন্তু এ গাছের কিছু করতে পারব না।

কারও হেফাজতের দরকার হয় নাই। আপন চেষ্টাতে গাছটি বাড়িয়াছে। মা আর ছেলেতে কথা হয়– কলম ঠিকমত করা হয়নি। সে কথা বাবাকে বলিতে গিয়া দু'জনে বকুনি খায়।

সে বাড়ির নিশানা হইয়াছে আমগাছটি। কেউ গোপালবাবুকে তাঁর বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বোঝান– কাঠজোড়ি নদীর ধার বরাবর পুরীঘাট পুলিশ ফাঁড়ির পশ্চিমে যেখানে পাঁচিলের মধ্যে আমগাছ দেখবেন সেইখানে আমাদের বাড়ি।

অনেক বন্ধুর কাছে এই দুষ্টু এই আমগাছটা স্বভাবের মানুষ গোপালবাবুর সহজ পরিচয় হইয়া দাঁড়ায়। গাছ আপনা আপনি বাড়িতেছে, আলো বাতাস আর মাটি হইতে সে তাহার আহার জোগাড় করিয়া বাড়ির পাহারাদারের মত দাঁড়াইয়া আছে।

নদীর ধারে গ্রীষ্মের গরম বাতাস সে তার সবুজ বুক দিয়া ঠোকায়। কাঠজোড়ি নদীর দিক হইতে ছুটিয়া আসা গরম বালির ঝাপটা আপন দেহ দিয়া আটকায়। সর্বদা সকলের কাছ হইতে নানা অত্যাচার সহ্য করিয়া সে চুপচাপ আপন মনে দাঁড়াইয়া থাকে।

গোপাল তার বন্ধুদের আনিয়া সেই আমগাছের তলায় বসায়। সবাই তারিফ করে, বলে এমন জায়গায় এমনি আমগাছতলায় বসে যত ইচ্ছা বই লেখা যায়। গোপাল খুশি হইয়া বলে– এটা আমাদের পোষা গাছ, তাই এত সুন্দর হইয়াছে। গাছ লাগানোর ইতিহাস গোপালের আর মনে ছিল না।

শহুরে জায়গা। অনেক দূর হইতে লোকের এই আমগাছটির কথা মনে পড়ে। পূজা, বিবাহবাড়ি– সব কাজে গোপালবাবুর কাছে অনুরোধ আসে আমপাতার জন্য, আমের আমের ডালের জন্য।

কেহ চাহিতে আসিলে গোপালবাবু নিজে আসিয়া গাছের কাছে দাঁড়ান– কচি পাতা নিও না, ঐ থাক, এত পাতা গেলে গাছে কি আর ফল

বাংলাদেশ-ভারত
মৈত্রী সমিতি

হোমটাউন প্রজেক্ট, লেভেল # ১৬, সুট # ১৫বি
৮৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
E-mail: info@bifs.org.bd, b_ifs@yahoo.com
(জিপিও বক্স # ৭৭৫)
ওয়েবসাইট: www.bifs.org.bd

ABSSI
Association of Bangladeshi Students Studied in India

ভারতে উচ্চশিক্ষা লাভকারী শিক্ষার্থী সমিতি
President: Dr. Dalem Chandra Barman
VC, ASA University, Dhaka
Phone: 01552 334300
Secretary: Shamim Al-Mamun
Phone: 01715 902146

কত ঝড় বৃষ্টি গিয়াছে, প্রতি বছর যত ফুল ফল ঝুঁড়ি ও পাতা সে ফেলিয়াছে আবার ততই আসিয়া ভরিয়াছে। গোপাল বড় হইয়া বুড়া হইতে চলিল, গোপালের বাবা মা ভাইবোন ভাগনে ভাইপো সকলেই আগাইতেছে, গাছটির বয়স বাড়ে না। হইয়াছে কাছের দালানটার সমান উঁচু। যতখানি জায়গা লইয়া ছিল তেমনি রহিয়াছে।

ধরবে? কত লোক আসবে, ঐ থাক।

এমনি অশেষ সাবধানতার সহিত গোপাল সেই ডাল-পাতা বিলায়। পোষা আমগাছের পাতাগুলি সব বুঝি গোনাগুনতি হইয়া আছে। বাড়ির সবাইকার এক চিন্তা– গাছে কবে ফল ধরবে?

– এই দেখেছ? আমগাছে বোল ধরেছে?

– বাঃ ভাল বোল হয়েছে, সব ডালে। আহা, বোল মোটেও যদি না ঝরে পড়ে, কত আম হবে।

– কেমন আম হয় দেখা যাবে।

– জাত আম ।

– কে জনে, বাবা তো নিজেই কলম করেছেন। ভাল কলমী গাছ ফার্ম থেকে আনলে হত না? তা না, নিজেই কলম করেছেন।

– আমরা ও আম খাব না।

– বাবা আমরা তোমার আমগাছের আম মোটেও খাব না। মা বলছে ভাল আম নয়।

– বেশ খেও না। গাছতো কেঁদে ভাসাবে কিনা তোমরা না খেলে।

কিন্তু সকালে সকলের মুখে উদ্বেগ। কুয়াশা হইয়াছে। আমের বোল ঝড়িয়া যাইবে– এই দেখ, বাতাসে মটর দানার মত বোল ঝরে পড়ছে । আগুন লাগানে পিঁপড়েগুলো সব খেয়ে ফেললে।

– আচ্ছা করে ডি-ডি-টি দেব, পিঁপড়ে মরে যাবে।

– আরে, আম হয়েছে!

বাড়িশুদ্ধ সকলে মিলে গুনিতে আরম্ভ করে। অনেকবার গোনা হয়। পাতার আড়ালে কোথায় একটা আবার বাকি রাইয়া যায়, হিসাবে ভুল হয়। – দেখ ছেলেরা, গুনে রাখ। দেখা যাবে কটা আম হয় এতখানি বোল থাকে?

পাড়ার ছেলেদের চোখে পড়িয়া যায়। ঢিপ ঢাপ ঢিল ছোঁড়া শুরু হয়।

– এই, নজর রেখো এই ছেলেগুলোর উপর।

আম হইলে কেউ তো খাইবেই। দুপুরে নজর রাখা এক কাজ হইল। প্রত্যেকটি আম এক একটি অমূল্য সম্পদ।

প্রথম আম ঠাকুরের কাছে ভোগ দেওয়া হইল। সে এক উৎসব। পাকিলেও আমের উপরটা সবুজ রহিয়াছে। ভিতরকার রঙ হলদে না হইয়া গেরিমাটির রঙ দেখাইতেছে। টক না হইলেও মিষ্টি নয়। সবাই এক এক ফালি খাইয়া তারিফ করে– বাড়ির হাঁদা ছেলেকে সবাই যেমন আদর করিয়া গায়ে হাত বুলায়।

– আমাদের আম খুন্টুনি দিয়ে পাড়ব। দেখেশুনে পাড়লে নীচে পড়ে থেঁতলে যাবে না।

বাড়ির সবাই মিলে খুব সাবধানে আম পাড়ে।

– আরে দেখেছ। ভাল করে দেখ, কাঠবেড়ালী আর বাদুড়ের চোখ এড়ায় না কোন আম। আমরা এতজনে মিলে আম পাড়লাম, তবু রোজ কাক বাদুড় কাঠবেড়ালীর এঁটো করা আম পড়ছে কোত্থেকে কে জানে। পিঁপড়েও মরেনি, আধখাওয়া আমে ঠিক লেগে আছে।

এত যত্ন করিয়া যে কয়টা আম ঘরে তোলা হয় তার গোনা-গুন্‌তি দুই চারটি করিয়া বিলানো হয় আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের। বাড়ির সকলের সঙ্গে একেবারে মিলিয়া মিশিয়া গিয়া আমগাছটি পরিবারের একজনের মত হইয়া উঠিয়াছে। কেবল তার নাম দেওয়া হয় নাই এই যা।

এই যুদ্ধের সময় আমগাছের উপর দিয়া এক বিপদ যাইতেছে। উড়োজাহাজ হইতে যদি বোমা পড়ে তাবে তার হাত হইতে বাঁচিবার জন্য সরকারের লোক ট্রেঞ্চ খুঁড়িয়া রাখিয়া গিয়াছে একেবারে আমগাছের গোড়া পর্যন্ত। সেইদিন হইতে গাছ হেলিয়া পড়িয়াছে পূর্ব দিকে। যতই ঠেকো দেওয়া যাক, সিধা হইতেছে না।

কী করা যায়? শিশুকালে টাইফয়েড হইলে ছেলে যেমন চিরদিন রুগ্ন থাকিয়া যায়, তেমনি– বোমা তো পাড়িল না– ট্রেঞ্চ খুঁড়িয়া আমগাছটিকে কমজোর করিয়া দিয়া গেল।

খোঁড়া মানুষের হাতে যেমন লাঠি দেওয়া হয়, হেলিয়া পড়া আমগাছকে একটা পেয়াঁরা গাছের দো-ফেঁকড়া শক্ত ডাল দিয়া তেমনি ঠেকো দেওয়া হয়েছে। পিঁপড়ে কাঠবেড়ালী সেইদিক দিয়া আর একটি পথ খুলিয়া গাছের উপড় যাওয়া-আসা করিতেছে। লোক আসিলে গেলে তার গায়ে সাইকেল ঠেসান দেয়।

ফি বছর সেই এককথা– এ বছর কত আম ফলবে? তিন বছরে একবার ফলন ভাল হয়। গেল বছর হইয়া ছিল একশো অপেক্ষা পাঁচটি কম। এবার দেখা যাক।

কারও হঠাৎ দয়া হইলে দুই এক তাল গোবর নয়তো একটি ঘটি জল ঢালিয়া দেয় গাছতলায়। সকলের নজর গাছের পাতার দিকে। এ বছর কাউকে পাতা দেওয়া হইবে না, গাছ কাহিল হইয়া যাইবে, ফলিবে না।

– মা, গাছটা রাস্তার উপরে বড্ড ঝুঁকে পড়েছে, যেতে আসতে মাথায় লাগে, বৃষ্টির সময়ে পাতার জলে গা ভিজে যায়। কেটে দেব কয়টা ডাল?

– দ্যাখ্ গোপাল, আমগাছে হাত দিলে ঝগড়া হবে তোতে-আমাতে।

এমনি শাসানি সত্ত্বেও গোপাল চুপি চুপি কয়েকটা সরু সরু ডাল কাটিয়া ফেলে, কাটিয়া একেবারে বাহিরে ফেলিয়া দিয়া আসে। মা জানিবার কী দরকার, রাস্তাটা সাফ হইলেই হইল।

তবু গাছটার কত মায়া। তার পাতার আড়ালে সব ক্ষতচিহ্ন সে লুকাইয়া ফেলে। গোপালের মায়ের চোখ তা ঠাহর করিতে পারে না। গোপাল গিয়া হাত বুলাইয়া দেয় গাছের গায়ে। ঠিক বন্ধুর মতই গাছ সব কথা লুকাইয়া রাখিয়াছে।

সে বাড়ির একটা অঙ্গ সেই গাছটি, বাহিরের লোককে পথ দেখাইবার জন্য বাহিরের বিজলি আলো জ্বালাইলে গাছ তাহা আড়াল করিয়া দেয়। ভিতরের কথা লুকাইয়া রাখে বাহিরের লোকের কাছে। বাহিরের লোককে আপন আড়ালের ওপাশে রাখে।

কত ঝড় বৃষ্টি গিয়াছে, প্রতি বছর যত ফুল ফল ঝুঁড়ি ও পাতা সে ফেলিয়াছে আবার ততই আসিয়া ভরিয়াছে। গোপাল বড় হইয়া বুড়া হইতে চলিল, গোপালের বাবা মা ভাইবোন ভাগনে ভাইপো সকলেই আগাইতেছে, গাছটির বয়স বাড়ে না। হইয়াছে কাছের দালানটার সমান উঁচু। যতখানি জায়গা লইয়া ছিল তেমনি রহিয়াছে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে দেখে মানুষের ছেলেরা ছোট হইতে বড় হইতেছে বুড়া হইতেছে।

প্রতি বৎসর কাক আসিয়া বাসা বাঁধে। বর্ষাকালে বেনে বৌ আসিয়া বসে। রাতে কাল পেঁচা আসিয়া ডাকে, রোজ কাঠবেড়ালী খেলা করে। বাড়ির পোষাকুকুর রোজ গাছতলায় প্রস্রাব করে। ফি বছর ছেলেপিলেরা তাহাতে দোলনা টাঙায়। তাদের কলরব কল্লোল, তাদের উৎসাহ আনন্দ সেই আমগাছটির গায়ে, গোড়ায় লুটাইয়া পড়ে।

প্রত্যেক বছর ঝড় বহিয়াছে। আমগাছ তাহাতে কাঁপিয়াছে। তার ডালে পাতায় পিঁপড়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। গাছের নীচে পিঁপড়া শিকার করিতে পিঁপড়া-বাঘ বেলে মাটিতে গর্ত খুঁড়িয়া বসিয়া থাকিয়াছে। বাতাস তেমনি গাছ জড়াইয়া, ডাল দোলাইয়া বহিয়া গিয়াছে। সে গাছ অজর।

ঘরের মানুষ মরিবার সময়েও দাঁড়াইয়া থাকিবে সব কিছুর সাক্ষি হইয়া। গোপাল কখনো-বা ভাবিয়াছে এই আমগাছে দড়ি দিয়া ঝুলিয়া যে দড়ি দিয়া ছেলেরা দোলনা টাঙাইয়াছে তাহাতেই ফাঁসি দিয়া ঝুলিবে।

গাছ জানে না, বোঝে না। তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া যে যা করে, যে যা ভাবে তার সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ নির্বিকার। দোলনা পাছে পড়িয়া যায় বলিয়া তার গায়ে ভোমর করিয়া মোটা পেঁচ আঁটা হইয়াছে। মানুষ আর গাছ জীবনের বিভিন্ন প্রকাশ, কিন্তু দুইই পোষ মানে। পোষা মানুষ কাজের বেলায় কৃতঘ্ন হয়, পোষা গাছ সর্বদা কৃতজ্ঞ আর বাধ্য।

ঝর আসে, আসিয়া। তাহাতে ভাবিবার কিছু নাই।

ঝড় আসে, আসিবে। তাহাতে ভাবিবার কিছু নাই।

সকালবেলা বাড়িতে হইচই। – আরে! দেখেছ কাল রাতে আম গাছ ভেঙে পড়ে গেছে! – ভাই, ওঠ! – আরে গোপাল ওঠ! আমগাছের দশা দেখেছিস?

সবাই ছুটিয়া গেল আমগাছের কাছে। গোপাল দেখিল আমগাছ পড়িয়া আছে মাটির উপরে মরা হাতির মত। তার দোলনা বাঁধা দড়ি তার ডালের নীচে চাপা পড়িয়াছে মরা মানুষের পরনের কাপড়ের মত। দাঁড়াইয়া থাকিতে যত উচু ছিল, পড়িয়া গিয়াও তার ডালপাতা তত উঁচু হইয়াই রহিয়াছে।

গোপাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিল গাছের একটা দিক উইয়ে অর্ধেক খাইয়া ফেলিয়াছে, ফোঁপরা হইয়া গেছে। আর অর্ধেক ভাঙিয়া গেছে।

– কিরে গোপাল, ওষুধ দিয়ে পিঁপড়ে মারছিলি না ? পিঁপড়ে থাকলে উই লাগত না। এত বড় গাছটাকে উইয়ে খেয়ে ফেললে। গেল–!

পিঁপড়ে তো মোটে রইল না, উইয়ের রাজত্ব হল। কাঁচা গাছটাকে ভোজ করে দিলে!

কাঠবেড়ালীগুলা দূরে ঘোরাফেরা করিতেছিল।

– আর কি খাবিরে, কাঠবেড়ালী? আমগাছ মরে গেছে।

নদীতে স্নান করিতে আসে যায় যাহারা, পথে চলা পথিকেরা দাঁড়াইয়া যায়, বলে– কী ঝড়টা না হয়েছিল, এত বড় ফলন্ত গাছটা উপড়ে পড়ল! আহা! আহা!

গাছটা কত ভাল। পড়িয়াছে যে, তা ঘরের উপর পড়ে নাই। বাড়ির উপরকার বিজলী বাতিটা ভাঙে নাই। দিনের বেলা পড়ে নাই। ডালে কাকের বাসা তেমনি আছে। কালো কালো ছানাগুলা উড়িতে শেখে নাই, চ্যাঁ চ্যাঁ করিতেছে।

সে গাছ আর নাই। ভারী বুদ্ধিমান গাছ ছিল। সেই হৃদয়বান আমগাছটি আর বাঁচিয়া নাই। কাঠুরিয়া আসিয়া কুড়াল দিয়া গাছের পাবে পাবে টুকরা করিয়া কাটিয়া দিয়া গেল। পাখির বাসাওলা ডালটি আর একটা গাছের গায়ে ঠেস দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিয়া দিল।

খবর-কাগজে লিখিয়াছিল– কটকে অর্ধরাত্রে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি। শহরের ভিতরে পুরীঘাটে আমগাছ উপড়াইয়া পড়িয়াছে। গাছটির মৃত্যু সংবাদ খবর-কাগজে বাহির হইল। কী কপাল জোর তার!

দুইদিন পরে সন্ধ্যাকালে গোপালবাবু কাহাকে নিজের বাড়ির নিশানা দিবার সময় বলিতেছিলেন– পুরীঘাট পুলিশের ফাঁড়ির পশ্চিম দিকে গেলে সেখানে প্রথম আমগাছ পাবেন– না না, ভুল বললাম, সে আমগাছটি পড়ে গেছে এই ঝড়ে।

আষাঢ়ের ঝড় আপন পরাক্রম দেখাইতে লুটিয়া লইল একটি নিরীহ নিরপরাধ আমগাছকে, তায় আবার সে ছিল দুর্বল, উইয়ে খাইয়াছিল। কিন্তু সে বাড়ীর সেই মানুষদের একটি বন্ধু ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল-সেই ঝড়ের রাতে।

অনুবাদ
জ্যোতিরিন্দ্রমোহন জোয়ার্দার

লেখক পরিচিতি

রাজকিশোর পট্টনায়কের জন্ম ১৯১৬ সালে। ওড়িয়া সাহিত্যের একজন শক্তিধর গল্পকার এবং ঔপন্যাসিক হিসেবে রাজকিশোর জনপ্রিয়। তিনি পেশায় আইনজীবী। রাজকিশোর একজন নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যসাধক। আধুনিক জীবনে নর-নারীর মানসিক দ্বন্দ্বের প্রকাশ তাঁর রচনার। তাঁর বিশিষ্ট গল্পগ্রন্থ: 'পখু কি', তুঠ পাথর', 'ভড়াথর', 'নিশান খুণ্ট', 'পথর চিমা'। উপন্যাস: 'অসরন্তি', 'সঞ্জবতী', 'সিন্ধুর গার', 'স্মৃতির মশাণি', 'চলবাট'।

ঘটনাপঞ্জি ❖ জুন

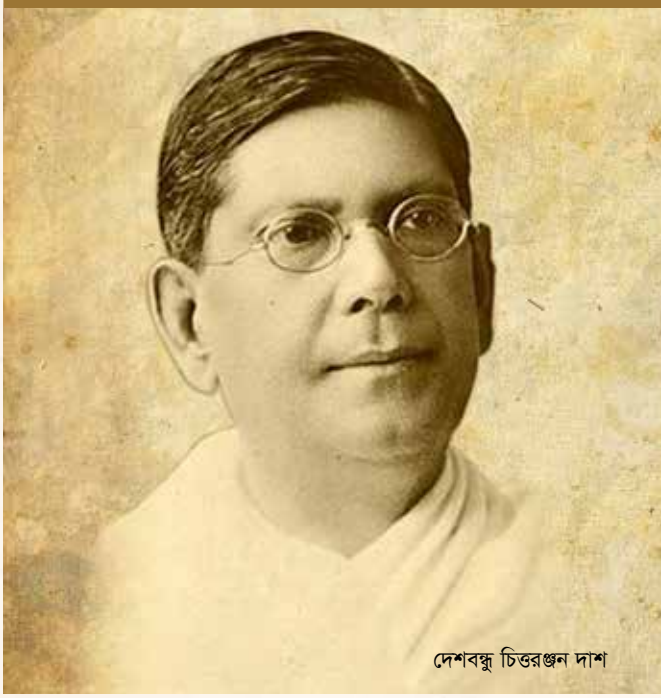
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

০১ জুন ১৮১৪ ❖ কলকাতায় ভারতীয় সংগ্রহালয় প্রতিষ্ঠা
০৩ জুন ১৯৪৩ ❖ দক্ষিণ ভারতের সুরকার ইলাইয়ারাজার জন্ম
০৫ জুন ১৯৬১ ❖ টেনিস তারকা রমেশ কৃষ্ণণের জন্ম
১১ জুন ১৯০১ ❖ প্রমথনাথ বিশীর জন্ম
১৬ জুন ১৯২৫ ❖ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু
১৬ জুন ১৯৪৪ ❖ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মৃত্যু
১৬ জুন ১৯৪৭ ❖ অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর জন্ম
২০ জুন ১৯২৩ ❖ গৌরকিশোর ঘোষের জন্ম
২৫ জুন ১৯৪১ ❖ গুরুসদয় দত্তের মৃত্যু
২৬ জুন ১৮৩৮ ❖ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম
২৯ জুন ১৮৬৪ ❖ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম
২৯ জুন ১৮৭৩ ❖ মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু
২৯ জুন ১৯৩৮ ❖ বুদ্ধদেব গুহের জন্ম

সেইসব বালিকা

চঞ্চল শাহরিয়ার

সেইসব বালিকা কোথায় রয়েছে আজ
স্কুলে যাওয়া-আসার পথে আমাকে দেখার জন্য
যারা সর্বদাই ব্যস্ত থাকত?
স্কুল পালিয়ে যারা আমার সাথে সিনেমা দেখত
কখনো-সখনো চলে যেত লং ড্রাইভে?

আমার অসুস্থতার কথা শুনে
যারা রোজা রাখত
খানজাহান আলির মাজারে
মুরগি মানত করত
সেই সব মিষ্টি বালিকা
কোথায় রয়েছে আজ কোন্ পরবাসে?

সেইসব বালিকা
যারা প্রাইভেট কারের গ্লাস নামিয়ে জিজ্ঞেস করত
এই যে শোনেন, কোথায় থাকেন? দেখি না যে?
বাসায় আসবেন কিন্তু, আসছেন তো?

জীবনের মানে খুঁজে পাওয়া যায়
জীবনকে নতুন করে সাজানো যায়
যেইসব বালিকার উচ্ছলতা
তারা আজ আইসক্রিমের মত ফুরিয়ে যাবে
এই ভয়াবহ দুঃসংবাদ আমি মানতেই পারি না।

মেঘবাতাসের কবিতা

দীপক লাহিড়ী

বৃষ্টি কিংবা বাদল এল রাতে
রাখো না কোন রাখো না ধরে সাথে
মনের ভেতর ঝুললে কোন তালা
বুঝবে ফুলের হয়েছে বাসি মালা
তেমন অধীর পায়ের সঙ্গে ছুটি
লেগেছে তাতে খণ্ড পাথর দুটি
স্বপ্নে মায়া পড়ল ঝরে রাতে
দেখেছ কোন তারার খসা ছাতে
বাড়লে প্রহর জীবনে মেঘ কালো
এবার জ্বালো ঘরের প্রদীপ জ্বালো
সময় ঘনায় হাস্নুহানা ফুলে
ঘটলে প্রমাদ ঘটেছে এক ভুলে
বন্ধ দরজা খুলতে যখন ছুটি
দেখতে পাই ছায়ার খুনসুটি
আমায় শুধু খুঁজো না দিনে রাতে
অন্ধকারে কেটেছে ভোর তাতে
বৃষ্টি আকাশ বাদল এল ঘরে
সজল হল মেঘের থরে থরে

দীপক লাহিড়ী ভারতের কবি

বৃষ্টিশেষে

অসীমকুমার বসু

বৃষ্টিতে তো আমিও ভিজেছি
পড়েছি মেঘের চিঠি
কার্শিয়াং পাহাড়ের ঢালে,
এখন অদৃশ্য ফুলের গন্ধ
ভেসে আসে অসমাপ্ত হিমেল বাতাসে।

ছোট রেললাইন ধরে ফিরেছি তাঁবুতে
নক্ষত্র টাঙানো রাতে
আগুন জ্বেলেছি নিরালায়।
নিরুদ্দেশ যাত্রা শেষে
একলাই ভিজেছি এতদিন,
তবু যে লেখা তোমার নামে
সে লেখা তেমনি রয়েছে পড়ে
সে লেখা চাওনি কোনদিন।

অসীমকুমার বসু ভারতের কবি

কুমির প্রকল্প

সোমনাথ রায়

জমিকে উর্বর করতে যারা ভবিষ্যৎ ভুলে খাল কেটেছিল
তাদের অনেকে আজ বাঁধ দিতে বদ্ধপরিকর
তারা কেউ কেউ স্বচ্ছ জলের রক্তিম আভা দেখে আঁতকে উঠেছে।
সোনার ফসলে যারা ঘর আলোকিত করেছিল
তাদের অনেকে পায়ে পায়ে এসে জমিকে ফিরিয়ে দিতে চায় শীতঘুম।
–তবে কি থামানো যাবে কুমির প্রকল্প? ভগীরথ কী বলেন?

সোমনাথ রায় ভারতের কবি

জনক

কাজল চক্রবর্তী

বীজ কবে পোঁতা হয়েছিল মনে নেই
অঙ্কুর থেকে সবুজ ছায়া ক্রমে ক্রমে
মেঘ-বৃষ্টি-রোদ-হাওয়া বুকে নিয়ে
বেড়ে ওঠার দিনগুলো আজ মনে পড়ে।
কিন্তু কিছু কিছু ঝড়ের রাত, কোন কোন কাঠুরের
চকচকে কুড়ুলের ফলা ঝলসে ওঠার কথা ভুলতে পারি না।

যে বটের ঝুরিতে কত সহজে দোল খেতে খেতে
পৌঁছে গেছি যৌবনে, আজ যৌবনের শেষ প্রান্তে এসে
আমার ঝুরিতে যখন দোল খায় আত্মজ-আত্মজা
তোমার দিকে তাকাই– দেখি তোমার সব ক'টি
ঝুরিই ছুঁয়েছে মাটি। তুমি মহাবৃক্ষ।
আমি এখনও সময় সুযোগ পেলেই তোমার ছায়ায়
রোদে সেঁকা চামড়াগুলো উজ্জ্বল করে আসি।

কাজল চক্রবর্তী ভারতের কবি

প্রাপ্তি

বিনয় দেব

পথ বলল মুচকি হেসে যাচ্ছি আমি অনেক দূর,
আমার সঙ্গে যাবে নাকি? পৌঁছে দেব অচিনপুর।
পথের পাশে গাছ ছিল
গাছে শঙ্খ চিল ছিল
বলল আমি উড়ে যাব অনেক দূরে চলে,
অনেক দিনের স্বপ্ন আমার আকাশ ছোব বলে।
মেঘ বলল হয় না কি তা?
আবোল তাবোল বকছ বৃথা
সত্যিকারের আকাশ ছোঁয়া অতই কি আর সহজ?
সারা জীবন উড়েও তবু পেলাম না তার খোঁজ।
নেই সীমা যার তাকে আবার কেই-বা ছুঁতে পারে?
তবু এ সংসারে অসীম আশায় যারা বারে বারে–
আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলে পথ,
একদিন পায় তারাই খুঁজে উজল ভবিষ্যৎ!

বিনয় দেব ভারতের কবি

বসতবাড়ি

বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়

বসতবাড়িটি ঠিক জেগে আছে, যেন পিরামিড
প্রত্নলোভী নাবিকেরা ওইখানে নোঙর ফেলেছে–
একটি চুম্বকখণ্ড: ব্যস্ত নাবিকদল, সবুজ শস্যের মত দাড়ি
নিরাকার সমুদ্রের মাঝখানে একমাত্র বাড়ি।

কেন সব ডুবে গেল, এই প্রশ্নে দ্বিমত রয়েছে
বক্তৃতামালার পাশে নির্বাচন কমিশন, কোর্ট রায়, সেন্সারের চোখ
পিরামিড অর্থে এক নীলনদ– মৃত ইতিকথা
বসতবাড়িটি তবু জেগে আছে সম্মতির মত।

কীসের সম্মতি, ভাবো, সমুদ্রযাত্রায় ওরা কত দিন গৃহহীন ছিল
এবং জানে না কেউ, বাড়িটিও, ব্যবহারযোগ্য হবে কিনা
চুম্বক টেনেছে যাকে, মরুবলয়ের কাছে সেও কত অসহায় ভাবো
ওখানে ভীষণ ভিড়, আকাশে চক্কর দিচ্ছে প্রাদেশিক সমুদ্রশকুন।

বসতবাড়িটি ঠিক জেগে আছে, কত দিন, এই প্রশ্নে চুপ
একটি জাহাজ তাকে ঘুরে ঘুরে মানুষ পাঠায়।

বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় ভারতের কবি

অপেক্ষা

দিলীপ কির্ত্তুনিয়া

কেউ কেউ অপেক্ষায় থাকে
সত্যিই জানতাম না।
একদিন উন্মোচিত হল সেই অপেক্ষা
গাঁয়ের ছোট্ট স্কুল বারান্দায়।
সেইদিনই দেখলাম–
অপেক্ষা কত রকম হয়–
গোপনে, চোখে, মনে, দূরে, বনে।

ঝাউবনে অমানিশা

খোরশেদ বাহার

যে ছিল সে নেই যা ছিল তা নেই
ঝাউশাখে বনচ্ছায়ায় তরুতলে বসে আছেন ঈশ্বর–
কার্তিকের মধ্য নিশীথে অমানিশার কালে
মঙ্গলদীপের তীক্ষ্ণ আলোতে বীতশ্রদ্ধ জেরেপাড়ার ঈশ্বর–
ইদানীং বসতবাড়ি গড়েছেন এই অন্ধকারের সখ্যে।

স্মৃতিগুলো পড়ে থাক খড়ের গাদায় স্তূপাকারে
চৈত্রের বুকফাটা জোছনায় তাজা বারুদ
মাঠময় ঘুরে মরে নিষ্ফল আক্রোশে
বিশ্বনারীর স্তন অনুভবে জেগে ওঠেন তিনি
বারুদ মাখানো জীবনকাঠিতে আঁচড় কেটে ঘুমিয়ে পড়েন আবার

অনন্ত হাহাকারমাখা ধবল জোছনায়
রূদ্ধশ্বাসে সরল রেখায় বিদীর্ণ করে তেপান্তরের মাঠ
ঝাউবনের আলো-আঁধারিতে স্মৃতির মিনারে মায়ায় গাঁথুনী
বুকের পাঁজর দিয়ে কে করে বিনির্মাণ কোন সে কারিগর

স্বপ্নের সেই জাদুকর শ্যামলকান্তি কুম্ভকর্ণ
আজও জেগে আছে সোনালি শস্যের দানায়
জোছনা ঝরানো সন্ধ্যায় চৈত্রের ঝিরি ঝিরি হাওয়ায়
জেলেবাড়ির হাজার কুপির আলোতে উজ্জ্বল মুখ তার

কিংবা পৌষের রাতে দুর্বাঘাসের নরম কুয়াশায় রেখে পা
কয়লার ইঞ্জিনে চিতার আগুন বুক তার জ্বলছে
জ্বলছে স্মৃতি খড়ের গাদায় নিস্তেজ শেফালিরা ঝরছে
যা ছিল এইখানে এই মনযমুনার অতল গহ্বরে

অবশেষে হিমবাহ বুকে নিয়ে স্বয়ং ঈশ্বরের সাথে
গুটি গুটি পায়ে তন্দ্রাহীন চাঁদনী রাতে একদিন ঝাউবনে
চলে যাব আরও দূরে কোজাগরী প্রিয়ার নিষিদ্ধ ভুবনে
নিষিদ্ধ সময়ে বুকফাটা হরিবৎবর্ণ চিতল জোছনায়।

দেখা হয়

রঞ্জনা রায়

জীবনের নীলনদে ভাসতে ভাসতে পৌঁছে গেছি,
এক ছোট্ট মায়াবী দ্বীপে,
বিস্তৃত নীলাম্বরীর সবুজ পাড়ে– আনমনা শ্যাওলা রঙিন মন,
চরৈবেতি জীবনে ক্ষণিক বিশ্রাম।
শূন্য হাহাকার– কল্পিত সুখে কিংবা দুঃখে।
সম্পর্কের চোরাস্রোতে ডুবতে ডুবতে,
আকাশলীন ছোট্ট পাখির কিংশুক ইশারায়–
চেতনের দরজা খুলে বাউল এ মন হারায়,
অবচেতনের সূর্যমুখী পাহাড় চূড়ায়।
তোমাতে আর আমাতে দেখা হয়,
দেখা হয় পদ্মের সহস্র আধারে
মোহনীয় চন্দ্রিল মুক্তকণায়।

রঞ্জনা রায় ভারতের কবি

ছোটগল্প

কোলবালিশের সতীনের নাম ভালবাসা

টৌকন ঠাকুর

এত ভোরে, এই নদীকূলে এসে এখন কি দেখতে পাচ্ছি? কি দেখতে পাচ্ছি নদীর ওপরে থমকে থাকা কুয়াশার ভেতর দিয়ে? নদীজল ও শূন্যতায় জমে থাকা কুয়াশাকে আলাদা করা যাচ্ছে না। ফলে, নদীর ওপারে কি আছে, কি নেই ধরাই যাচ্ছে না। এ নদীর নাম কি? জানা নেই। এ নদী কোথা হইতে আসিয়াছে কোথায় যাচ্ছে– তাও ঠিক ঠাহর করা মুশকিল। ভোরের প্রথম রোদে নদী দেখব– এটা কোন ব্যাপক তাৎপর্য বহন করে না। না কি করে? নদী পাড়ে এত শীত, এত শীত। নিশ্চয়ই শীত সংগ্রহ করতে আসিনি আমি! নিশ্চয়ই কুয়াশা কুড়োতে আসিনি! কী কুড়োতে এসেছি তবে? কী পেতে এসেছি তবে পৌষালি ভোরের নদীপাড়ে? যদি কবিতায় নদী ধরতে চাই, তাহলে তা ঘরে বসেই ধরা যায়। একটি শাদা পৃষ্টায় লিখে দিলেই হয়ে যায়, নদীর মধ্যে ঝাঁপ দিচ্ছে এক জলপিপি, বলে যাই, আমি জলপাখিটার যমজ ভাই। যদি কবিতায় কুয়াশা লিখতে চাই, লিখতাম, কুয়াশাকে আপন বলে জানি, উতলা কুয়াশার মাকেও আমি চিনি, চিনতাম সেই শাদা থান পরা বুড়িকেও, যে কুয়াশার নানী। নিশ্চয়ই ভোর ভোর বলে কোন ঘোরও আমাকে আজ, এখন, এই শীতের নদীর কূলে আপ্যায়নে ডাকেনি! নাকি ডেকেছে? প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে, উত্তর মিলছে না।

প্রশ্নের পতাকা উড়ছে হাওয়ায়, হাওয়া বড্ড হৈম, এই হৈম হাওয়া আমাকে ডেকেছে? তবে আর এসেছি কেন?

নদী দেখার নামে আসিনি, কুয়াশাও দেখব না, কুয়াশা দেখার কিছু নেই তুমি ছাড়া। ভোরের দেখার কিছু নেই, তুমি ছাড়া। রেললাইন ধরে একা হাঁটা যায় না। কারণ, তোমার নিজেরও অজানা, তুমি আমাকে নির্দেশ করে চলেছ আর আমি সেই নির্দেশে নির্ঘুম আমি সহস্রবছর। আমার চোখের নিচে অগণন রাত্রির ইতিহাস গ্রন্থিত আছে।

ভোর-কুয়াশার ঝাপসাতিঝাপসা দৃশ্য-বাস্তবতার মধ্যেই দুয়েকটি পাখি, কি পাখি? তারা ঝুপ করে উড়ে গিয়ে নদীজল থেকে মাছ ধরে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে। যন্ত্র-সভ্যতার কতদূরে এই নদীভোর? মনে হল, ঠিক এ সময়ই দূরে ভেসে যাচ্ছে রেল– হুইসেল নয়, ওটা কি আমার শ্রুতি-কল্পনা? নিকটে-দূরে তো কোন রেললাইনই নেই, হুইসেল আসবে কোত্থেকে? তবে কি আমার মনের মধ্যে কোন রেললাইন চলে গেছে? মনের মধ্যেই প্রতিবিম্বিত আছে এক পুরনো দিনের ইস্টিশন? মনে– মনের সেই রেল চলে গেল, এ সময়? নাকি কুরোসাওয়ার কাক চিত্রে গমক্ষেতের মধ্যে যখন ভ্যানগগ হাঁটছিলেন ইজেল-ক্যানভাস, রঙ-তুলি সরঞ্জাম নিয়ে, আর তক্ষুনি গমক্ষেতের ওপর দিয়ে কা কা করতে করতে উড়ে এল একদল কাক, আর সে-সময়ই তীব্র শব্দে হুইসেল বাজিয়ে গেল একটি রেলগাড়ি, নিজের বন্দুকের গুলি আর্টিস্ট নিজের মাথায় চালিয়ে দিয়েছেন। এই ভোরে, শীতনদীর কূলে আমার মাথায় কি সেই শব্দ ঝাপটানি দিয়ে গেল? কিংবা এরকমও কি পরে মনে হবে যে, ভেরের নদীপাড়ে কুয়াশায় প্লাবিত একটি ভোর, এরকম সাবজেক্টের একটি ওয়াটার কালার চিত্রের সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি। সেই চিত্র শাসন করেছ সময়, পরিপার্শ্ব, আমাকেও? আরে না! তা হয় কী করে? আমি তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি কুয়াশা, কুয়াশার ভেতর দিয়ে পুব আকাশের আভা। আমি তো নিজের কানেই শুনতেই পাচ্ছি শব্দ, জলপিপিদের ডানার ঝাপটানি। নিশ্চয়ই এ মাধুর্য মিথ্যে নয়, এই লাবণ্য মায়া নয়, সত্য। তাহলে, কী সেই সত্য, যার জন্যে আমি এত ভেরে আজ এই নদীকূলে ঘোরে পাওয়া মানুষের মত একাকী এসেছি? জেনে-বুঝে এসেছি? পথ চিনে এসেছি? সারারাত হাঁটতে হাঁটতে নদীপাড়ে এসে এসব দেখছি?

সারারাত হাঁটতে হাঁটতে এসেছি, মানে কী? রাতে মানুষ হাঁটে নাকি? ঘুমোয়। তাহলে আমি ঘুমোইনি? না-ঘুমোনো মানুষের দলে আমি! কেন? ঘুমোইনি কেন? নাকি ঘুমোতে পারিনি? কেন ঘুমেতে পারিনি? কতরাত ঘুমোইনি? কতরাত আমি নির্ঘুম জানালার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জানলার ভেতর দিয়ে আয় ঘুম আয় ঘুম ডাকতে ডাকতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছি চিন্তা ধরেছি নামতা পড়েছি ঘুম ঘুম ঘুম আয় ঘুম ঘুম ঘুম হিম-মৌসুম পাড়ি দিয়ে দিয়ে কত কী দৃশ্য দেখতে দেখতে কত কী স্বপ্ন ভাবতে ভাবতে কত কী টপ্প আঁকতে আঁকতে দাঁড়ি কমাহীন দীর্ঘ বাক্য হেঁটে ফেলেছি। এবার একটু থামি। কোথায় থামব? কোথায় থামব না, সেও এক ব্যক্তিগত নির্দেশের ব্যাপার। আমার ব্যক্তিগত নির্দেশ করে কে? কে আমাকে নির্দেশ করে এই ভোর নদীর বারান্দায় নিয়ে এসেছে? কার নির্দেশে আমি অনিদ্রিত, জানলা ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়েছি! কার নির্দেশে আমি রাস্তার মোড়ের সেলুনঘরে ঢুকে পড়ি? আয়নায় তাকিয়ে কেন দেখে নিই, চুলগুলো ঠিক আছে কীনা!। শার্টের কলারটা ভাঁজ ভাঙা ছিল। কার নির্দেশে সেলুন থেকে বেরিয়ে পোস্ট অফিসের পেছনে কামিনীগাছের গলি দিয়ে কোন কারণ ছাড়াই দিনে তিন-চারবার ঘোরাঘুরি করি? আসলেই। ব্যাপারটার নির্দেশক কে?

এই যে কয়েকবছর আগে মানিকগঞ্জের পিরাইলে শর্ষেফুলের মাঠে গিয়ে হলুদের ওপর আছাড়ি-বিছাড়ি করে ব্যাপক ছবি-টবি তোলা হল, কেন? কেন বারবার সমুদ্রে গেলাম। কেন? আমি কি মাছধরা জেলে, নাকি জাহাজের নাবিক? আসলে তো আমি তেমন কেউ না, সমুদ্র কেন ছোটখাটো নদীর একটা ঢেউও না, তাহলে আমি সমুদ্রে যাই কেন? এমন সম্ভাবনা তো আমি মোটেও দেখছি না যে, আমি বঙ্গোপসাগর লিজ নিয়ে চিন ঠেকাতে আমেরিকান বন্দর বানাব, কিচ্ছু না, তাহলে আমার সমুদ্রগমনের উদ্দেশ্য কি? কবিতা লেখার জন্য যে সমুদ্র দরকার, তা তো পুরাতন কবিতা পড়তে গিয়েই পেয়ে গেছি। তাহলে? আমি তো পাহাড়ের আতঙ্ক বা এরকম বিপজ্জনক কেউ না। আমি ভ্যাটিক্যান পোপের প্রতিনিধিও না। যদি তাই হয়, তাহলে তো আমি পাহাড়ে যেতে পারি না। আমি বুদ্ধ বা অতীশ দীপঙ্করের ডিরেক্ট স্টুডেন্টও না। তারপরও, পাহাড় আমাকে ডাকছে বলে একটি ছুতো বের করেই বান্দরবান-বগা লেক! কেওকারাডংয়ের চূড়ো! তেমনিভাবে, আমার জঙ্গলে যাওয়ার কথাও নয়। কোন বনভূমিই আমার ব্লাড কানেকটেড নয়। তবু যাই। হিসেব-নিকেশ না করেই আমি যাই। খেয়াল থাকে না, খেয়াল রাখতেও চাই না যে, কোথায় যাচ্ছি? খেয়াল যে রাখব, খেয়াল রাখার জায়গাই তো নেই। এমনকি অর্থও রাখার জায়গা নেই। এমন কি আমার ঘুমোনোরও জায়গা নেই। বিছানা একটা আছে বটে, তবে সেখানে একা ঘুমোনো বিপজ্জনক মনে হয়। কেন একা ঘুমোনো বিপজ্জনক, সে ফিরিস্তি এখানে দেব না। তাইলে ধান ভানতে শিবের গীত হয়ে যাবে। আচ্ছা, শিবের গীত ধরলাম না হয়, প্রাতিষ্ঠানিকতার পুরাতন রোগকে সৌন্দর্য বলে মানতেই হবে? কেন? আমি মানলাম না। মানলে আছে, না মানলে নেই, দিগন্তরেখা। এ নিয়ে চার লাইনের একটা কবিতাও আছে, আমার লেখা– ভূগোলমাস্টার– এ আমি এক যুগ আগে বলেছিলাম, এই আকাশ আমার পিতা। মাটি আমার মা / আমি তাদের সন্তান, ঐ দিগন্ত। কিন্তু ভূগোলমাস্টার বলছেন– দিগন্ত একটি ধারণামাত্র।

তো যা বলছিলাম... কী বলছিলাম যেন! কোপার্নিকাসের সূত্রের কথা? কনফুসিয়াসের চিন্তার কথা? বিছানায় একা বিপজ্জনক শোয়াশুয়ির কথা? নাকি কে আমাকে নির্দেশ করে এই জলঝিরি নদীকূলে নিয়ে এসেছে, তার কথা? কার কথা? যার কথা শুনব বলে সারারাত হাঁটি? যার মুখ দেখব বলে মাইল মাইল চরাচরে নির্ঘুম রচনা লিখি। যার সঙ্গে দেখা হবে বলে আমি নদীর ওপারে যেতে চাই। কত কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলি, যদিও, আমার সকল গান তোমারেই লক্ষ্য করে। এই গান নিশ্চয়ই ইংরেজি গান নয়, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, তাতে কি? সে-জন্যেই তো আমার ভালবাসাটাও অনেক বড়। আমি না হয় কিছুকাল আগেই জন্মেছি, সে কি আশার ইচ্ছেয়? তুমি যে জন্মালে, সে কি তোমার ইচ্ছেয়? ভালবাসি, ভালবাসতে ভাল লাগে, না বাসলে খারাপ লাগে, শরীর খারাপ হয়, মন খারাপ, মন-শারীর তো টু-ইন ওয়ান, খারাপ হলে বাঁচি কী করে? বুঝবা না? তুমি না বুঝলে বেঁচে থেকে কী লাভ?

নদী দেখার নামে আসিনি, কুয়াশাও দেখব না, কুয়াশা দেখার কিছু নেই তুমি ছাড়া। ভোরের দেখার কিছু নেই, তুমি ছাড়া। রেললাইন ধরে একা হাঁটা যায় না। কারণ, তোমার নিজেরও অজানা, তুমি আমাকে নির্দেশ করে চলেছ আর আমি সেই নির্দেশে নির্ঘুম আমি সহস্রবছর। আমার চোখের নিচে অগণন রাত্রির ইতিহাস গ্রন্থিত আছে। ইতিহাস কালো হয়ে গেছে। ইতিহাস ধূলো হয়ে গেছে, স্রেফ তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি বলে। ইউনিভার্সিটি এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়েছি, ক্লাস করিনি, দুপুরে খাওয়াও হয়নি, বিকাল থেকে সন্ধ্যা পার করে দিয়েছি তোমার পায়ের চপ্পলের শব্দ শুনব বলে। এত অপেক্ষা! এত উৎকর্ণ! ভালবাসি বলেই। কাকে? তোমাকে। তুমি কে? এই তুমি কোথায় থাকে, কবি নিয়েজিত হল তুমিতে। এই তুমির সন্ধানে কত রক্তপাত, কত স্বপ্নভঙ্গ! বাঙালি নারীর হাতে সেলাই করা কাঁথায় ফোঁড়ে ফোঁড়ে যেমন তার শ্বাস– দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে থাকে, প্রতিটি কবিতায় শব্দের ভাঁজে ভাঁজে তুমি লুকিয়ে আছ, এ তুমি জান না। তুমিই জান না তুমি লুকিয়ে আছ কবির কবিতার ভাঁজে ভাঁজে। কারা যেন গান গেয়ে যায়– এ তুমি কেমন তুমি?

তুমি তো তুমিই। তুমি আবার কেমন হবে? তোমায় যেমন ভাবি আমি, তুমি কি ঠিক সেই রকমই তুমি। তোমার নির্দেশেই না আমি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা শাদা শূন্যতায় মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি সাতটি তারার তিমির!

কারণ, তোমাকে ভালবাসি। কারণ, তোমাকে ভালবাসতে আমার ভাল্লাগে। কারণেও ভাল্লাগে, অকারণেও লাগে। কী যে লাগে! এই লাগাটা কি জিনিস– এই নিয়ে সমাজের তিনজন গুণী মানুষকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি। বলি একটু? একজন অধ্যাপককে বললাম, বলুন তো লাগাটা কি জিনিস?

অধ্যাপক ভ্রু কুঁচকে জানতে চান, লাগা মানে? বললাম, ভাল্লাগা। তারপরও অধ্যাপকের চোখ ব্যাকরণ থেকে সরে না, বললেন, কি বলছেন এসব? এ প্রশ্ন আমাকে কেন? আমি ভাল্লাগা কথাটার অর্থ অধ্যাপকের কাছে ভাল করে তুলতেই পারলাম না। ফলে, এরপর পাই এক ব্যবসায়ীকে, বলি, ভাল্লাগার কারণ বলতে পারেন? কি ভাল্লাগায়? মানে ভালবাসতে ভাল্লাগার কথা বুঝাচ্ছিলাম আর কি! ব্যবসায়ী আমাকে বলে দেন, এসব নিয়ে ভাবার মত টাইম কোথায় বলুন, আমাদের তো কাজ করে খেতে হয়। তোমাকে যে আমার ভাল্লাগে, সে কথায় কারণ খুঁজে না পেয়ে গেলাম এক ডাক্তারের চেম্বারে। সব বলি ডাক্তারকে। তিনি ফিজিওথেরাপিস্ট। বললেন, আপনার তো শারীরিক প্রবলেম দেখছি না, সমস্যা কি? বললাম, আমার এক তুমিকে খুব ভাল্লাগে। কিন্তু বয়সে আমার থেকে বেশ ছোট বলে তাকে ঠিক কিছু বলতেও পারছি না। আই লাভ ইউ যদি বলি, শুনে সে যদি আমাকে বলে, আগেও যেরকম একজন বলেছিল, আঙ্কেল, আপনার কবিতা পড়েছি। ভাল লেগেছে। যদি ওরকম হয়?

ডাক্তার আমাকে সমাধান দিতে পারলেন না, ডাক্তার তো শেষপর্যন্ত আমাকে জ্ঞান দিতে শুরু করলেন, আরে ভাই, বয়স একটা ফ্যাক্টর না? কিসের ফ্যাক্টর? ফ্যাক্টর বলতে মনে করেন মেয়েটার তো আপনার কবিতা ভাল্লাগছে, তাই বলে সে কি আপনার কবিতা নিয়ে নেবে নাকি? নিতে চাইলে নিক। দিয়ে দেব। কবিকেও দিয়ে দেব। কবি দিয়ে সমাজের কী হয় শুনি? কিছুই হয় না।

আমি চলে এলাম কিছুই হয় না বলে। কিন্তু আমার কিছু হচ্ছে। সবসময়, মনের মধ্যে একটা চৈত্র চৈত্র হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, গাছ থেকে শুকনো পাতারা ঝরে ঝরে পড়ছে আমার বুকের ওপর, আমি মাটিতে শুয়ে আছি। আমি গাছ হয়ে যাচ্ছি। আমার পাতা ঝরে যাচ্ছে। আমার গায়ে হাওয়া লাগছে। চৈত্র চৈত্র হাওয়া। খর্খরে হাওয়া। কী নেই কী নেই হাওয়া। বসন্তে তাই মোটেই ভাল্লাগছে না। ভাল্লাগে তোমাকে। তুমি কোথায়? শুধু কবিতায়? পুরা একটা টোস্ট বিস্কুট খেয়ে এক গাস পানি খেলেও একবেলা কাটানো যায়, পুরো একটি কাব্যগ্রন্থও খেয়ে বাঁচা যায় না। খাওয়াই যায় না।

কিন্তু টোস্ট-বিস্কুট আর কতক্ষণ? খেতে হবে এক থালা ভাত। এক থালা ভাত নিশ্চয়ই 'কালবেলা অবেলা'র চেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী। খেয়ে বাঁচা যায়। খিদে পেটে এক থালা ভাতের কণার মত নক্ষত্রদানা হলে কি চলবে? কিন্তু ভাত খাওয়ার পর না হয় একটা বিড়িও ধরালাম, তারপর ধরাব কি? মন? ভালবাসার কথা মানেই মনের কথা, ভালবাসার ব্যাপার মানেই মনের ব্যাপার– এটাই দেখি। আবার মনই বা জিনিসটা কি? মন শরীরের কোন জায়গায় অবস্থিত? 'দেহ পাবি মন পাবি না' বলে ভিলেনের আস্তানায় নায়িকা যে চিৎকার করে বলল, এর অর্থ কি? নায়িকার দেহ যতটা ফ্যাক্টর, মনও ফ্যাক্টর, বুঝলাম, কিন্তু নায়িকার দাদী-নানীর মন-দেহ কি ফ্যাক্টর না? ভালবাসায় যৌবন ও যৌনতা যে তীব্র উপাদান, তা তো অস্বীকারের কিছু নেই। নেই বলেই, বুড়ি বা বুড়োদের চরিত্রে ভালবাসার ব্যাপার-স্যাপার নেই। ভালবাসা সব যুবক-যুবতীদের ফ্যাক্টর। কারণ, যৌবন, যৌনতাকে এড়িয়ে যে কবিতা, যে শিল্পকলা, তা আসলে হয় শিশুতোষ না হয় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের শিল্পকলা। বাংলাদেশ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের শিল্পকলার দেশ, যদিও ভালবাসার ভেতর দিয়েই সবার যাত্রা চলছে মানে যৌবন-যৌনতার ভেতর দিয়েই মানব-বংশের যাত্রা অব্যাহত আছে। নইলে ধেই ধেই করে বিশ কোটি মানুষ হয়ে গেল কী করে?

তো নিজের কথায় আসি। মেয়েটি বয়সে আমার থেকে ছোট। আমি ওকে ভালবাসি। বয়স আমার মধ্যে ফ্যাক্টর নয়, সমাজে ফ্যাক্টর। সমাজ কি? সমাজ হচ্ছে একটা গোয়ালঘর। এর বেশি বলা ঠিক হবে না। যে যৌনতা বাণিজ্যের ব্যাপার হয়ে আছে দেশে দেশে, অপ্রকাশ্যে ঠিক আছে, প্রকাশ্যে নিষেধ। ভালবাসা এখানো প্রকাশ্য নয়, নাকি ভালবাসা ব্যাপারটা গোপনীয়, তা নিয়ে আলোচনা করা যায়। কিন্তু আলোচনা করার চেয়ে ভাল না, ভালবাসা? আবারও বলছি, আমি ওই রাইকিশোরীকে ভালবাসি, কারণ, ভালবাসতে ভাল্লাগে। ভাল্লাগাটা সুখ। সুখ কে না চায়? দয়াল সুখেরও লাগিয়া... বলে কি কম গান শুনলাম?

আমাদের এক কবি, আকালপ্রয়াতই বলা যায়, ত্রিদিব দস্তিদার। তার প্রকটি কবিতার বইয়ের নাম 'ভালোবাসতে বাসতে ফতুর করে দেব'। দ্যাখেন, কী সাংঘাতিক আত্মবিনাশী উচ্চারণ। ভালবাসলে আত্মনাশও ঘটে। সেই ঘটাটাই তার ভালবাসা, তার ভাল্লাগা। ভাল্লাগা যার যার মতন, কেউ শুটকি মাছ খেতে দারুণ ভালবাসে, কারো শুটকি মাছের রান্নার ঘ্রাণ বা গন্ধেই বমি আসে। তাহলে ভালবাসা হচ্ছে শুটকিমাছের বাস্তবতা, বলা যায়? না, কিছুই বলা যায় না, ভালবাসায় কিছু না বলেও বলা হয়ে যায়। কোন ভাষাই লাগে না, ইঙ্গিত হলেই হয়। এরপর ইঙ্গিতও লাগে না, জাস্ট একটা লুক। দেখা। কিন্তু না দেখেও, না জেনেও 'পিরিত' হয়ে যায়, রেকর্ড আছে। রেকর্ড হ্যাজ।

তাহলে কি দাঁড়াল? কিছুই দাঁড়াল না। সবই বসে গেল। বসেও নেই, শুয়ে পড়ল। ভালবাসা শুয়ে পড়ল আমার পাশে, ভালবাসা শুলো বলে কোলবালিশ সরে গেল। কোলবালিশ যেন তার সতীনকে দেখতে পেল আমার পাশে, এককথায়, কোলবালিশের সতীনের নাম ভালবাসা, যদি সে আমার পাশে শোয়। আমাকে জড়িয়ে ধরে। আমাকে মুড়িয়ে ধরে। আমাকে পেঁচিয়ে মারে। আমাকে খুঁচিয়ে মারে। শীতের রাতেও আমাকে বিবস্ত্র করে ছাড়ে, সেই তবে ভালবাসা। সেই আমার ভাল্লাগা। সেই আমার দেবী, যতই সে বয়সে আমার চেয়ে বা বড়, সমান বা ছোটমোটো হোক, তাকেই আমার প্রণতি, প্রেম, পূজা, অর্ঘ, সমর্পণ। সেই তাকেই তো বলি তুমি। ভালবাসার তুমির সঙ্গে যখন আমি মুখোমুখি, কাছাকাছি, পাশাপাশি উৎকর্ণ থাকি, শুনতে পাই, অ্যাম্বিয়েন্স রীতিমত। কেমন যে লাগে। আমি ওর দিকে তাকাই, ও আমার দিকে তাকায়, লোকেশন নদীর ধার, ব্যাকগ্রাউন্ডে সানাই, আর কোন ক্যারেক্টর নেই, সময় ভোর, এরকম একটা প্রাকৃত বাস্তবতায় আমরা দু'জন, আমি আর আমাকে 'আঙ্কেল, আপনার কবিতা আমার ভাল্লাগে' বলা রাইকিশোরী, আমরা পরপর দেখছি। আমার ভাল্লাগতেছে। ভাল্লাগাটাই সুখ। অনেক গান শুনেছি, দয়াল সুখেরও লাগিয়া...। সুখ পাচ্ছি। সুখ পাচ্ছ তুমি? ওহ সুখ! আহ সুখ!

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলে এক লোক ছিলেন, সেই লোক বলেছেন, 'ওরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না, কেবলই মায়ার ছলনায়...' এ কী কথা? আসলে কথার কি আর শেষ আছে? ভালবাসারও শেষ নেই। ভাললাগারও শেষ নেই। রবীন্দ্রনাথেরও কথার কোন উল্টো-সোজা নেই। এক রাতে কবি লিখলেন, 'যাব না আজ ঘরের বাহিরে' আবার অন্য এক রাতে তিনি উল্টো লিখলেন, 'বাহির আমার ডাক দিয়েছে, থাকব না কো ঘরে'। যখন যা ইচ্ছে, লিখেছেন। যখন যা ইচ্ছে, তা পূরণই সুখ। সুখই হল ভাল লাগা, ভালবাসা। এ নিয়ে এত কথারও কিছু নেই, বিষয়টা বলার নয়, লেখারও নয়, করার, অনুভব করার, রূপায়ণ করার। করতে করতে, অনুভব করতে করতে, অনুভূতির মধ্য দিয়ে একটা রাস্তা মনে হয় পাওয়া যায়। সেই রাস্তায় কোন জ্যাম-জুম নেই, আমি হাঁটতে হাঁটতে যাই, ভাবতে ভাবতে যাই, সুখ-ভালবাসা পাই, পেতেই তো চাই। দিতেও চাই। এই পেতে চাওয়া আর দিতে চাওয়া যখন এক সুতোয় দাঁড়িয়ে যায়, সঙ্গম হয়ে যায়। কবিতা হয়ে যায়। তখনই মূলত 'সুখ' শব্দটা লিখিত রূপ থেকে ইমপ্লিমেন্টেশনে পৌঁছয়। আমি তা ভালবাসি। ভালবাসি বলেই লিখি, লিখি না। ভালবাসি বলেই ঘুমোই, ঘুমোই না। সারারাত হাঁটতে হাঁটতে কোন এক নদী তীরে এসে পৌঁছই, যে নদীর নাম আমার জানা নেই। ভালবাসি বলেই ছবি, ছবির মধ্যে ছবি হয়ে থাকার আনন্দ লাভ করতে চাই।

এই আনন্দ চাই বলেই ভালবাসা, ভালবাসা আছে বলেই বেঁচে আছি, নইলে দুনিয়ার মত এই আকাট জায়গায় থাকে কে?

টোকন ঠাকুর
কবি, চলচ্চিত্রকার

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

পাসিং শো

অমর মিত্র

তিন.

শম্পা জিজ্ঞেস করল, তারপর?

গুনগুন করে অতীন,

নদীটি গিয়াছে চলিয়া, /পথ পড়ে আছে ধূলায়,
পথটি গিয়াছি ভুলিয়া, /মন পড়ে আছে কূলায়।
কুলায় ফিরিব বলিয়া, /ধূলায় ধুসর হয়েছি।
নদীটি গিয়াছে চলিয়া, /ঘাটে একা আমি রয়েছি।
নদীটি বাঁকে মিলালো, /ধূলি ধুসরিত হইয়া।
প্রিয়তমার মুখ ভুলিয়া, /নদীটি গিয়াছে চলিয়া।

কী সুন্দর, কার গান?

অতুলানন্দ রায়, তিনি পরে আর গেয়েছিলেন কি না আমি জানি না। বিড়বিড় করল অতীন, তিনি ছিলেন বাবার কলিগ, কিন্তু বাবার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, প্রায় বছর কুড়ির উপরে তো হবেই।

ইস, গানের কথা খুব সুন্দর, কে লিখেছিলেন?

বোধহয় বাবা। বিড়বিড় করে অতীন, বাবা গান লিখতেন, তা কি জান?

কী করে জানব, তুমি কি বলেছ?

বাবার লেখা কয়েকটি গান রেকর্ড হয়েছিল।

কী গান?

গীতিকারের নাম মুছে গেছে শম্পা।

তা হয় নাকি, প্রণব রায়, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, তাঁরা কি মুছে গেছেন?

বাবা সুবিনয় বসু তো অমন গুণী ছিলেন না, কিন্তু তিনি লিখতেন গান, রেডিওতে একবার এ মাসের গান প্রোগ্রামে গাওয়া হয়েছিল তাঁর লেখা গান, কিন্তু সেই একবারই, আর হয়নি, রম্যগীতি জান?

শম্পা বলে, আমার কাজ ভণ্ডুল করে দিলে আজ।

সবদিন কি হিসেবে চলে। বলে অতীন।

শম্পা বলল, রম্যগীতি, অনুরোধের আসর, শুক্রবার রাত আটটার নাটক, রেডিওকে তুলেই দিল একেবারে, এফএম ছাড়া অন্য স্টেশনগুলো ধরাই যায় না।

বাবা রেজিস্টারড গীতিকার হতে হতে হতে পারেননি, বলতেন, যাক গে, সবাই তো সব পায় না।

অতীনের মনের ভিতরে তখন অতুলানন্দ রায়ের গানের কথা ভেসে উঠছিল। শম্পা আর দাঁড়ায় না। সকালে কি অত সময় দিতে পারে সে? ব্রেক ফাস্ট বানাতে হবে। ছেলের ঘুম ভাঙল বলে। অতীনের আজ অফিস নেই, কিন্তু সে বেরোবে দুপুরে। কোথায় আড্ডা হবে। কেউ কবিতা পাঠ করবে, কেউ গান শোনাবে, কেউ গল্প। অতীনের চাকরি আর দু'বছর।

শম্পা জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ মনে পড়ল যে?

ওই যে অনল চট্টোপাধ্যায় মারা গেলেন, তাঁর সুরের গান, যদি চলকে পড়ে কল্কে ফুলে... গান থেকে গান আসে, সুর থেকে সুর, আচমকা এল, কী করে মনে এল বল দেখি, আর তা থেকে স্মৃতি, চলে যাওয়া মানুষ। বলতে বলতে গলা ভার অতীনের, এই গান যিনি লিখেছিলেন তিনি শুনেছি চুঁচুড়ার ঐদিকে কোথায় থাকেন। কিন্তু তাঁর কথা কি কারো মনে আছে?

শম্পা বলল, অমন হয়, সেদিন আচমকা এফএম-এ সুমন কল্যাণপুর-এর একটা গান, মনে কর আমি নেই, বসন্ত এসে গেছে, কৃষ্ণচূড়ার বন্যায় চৈতালি ভেসে গেছে... শুনে আচমকা চোখে জল এসে গেল কেন?

অবাক হয়ে বছর পঞ্চাশের শম্পার দিকে তাকিয়ে থাকে অতীন। কত বছর ঘর করছে তারা? তিরিশ তো পেরিয়ে গেছে। শম্পাকে কি সে বুঝেছে, জেনেছে? গান শুনলে চোখে জল। সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল তার আটপৌরে বউকে। বলল, আমি ওই গান শুনেছিলাম শ্মশানে।

তার মানে?

আমাদের ইস্কুলের ইংরিজির স্যার অমূল্যবাবু মারা গিয়েছিলেন, তাঁকে দাহ করতে আমরা কাশী মিত্তির ঘাটে সমস্ত রাত ছিলাম, তখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি, ঘাটের পাশে কোন এক শ্মশান কালীর পুজো হচ্ছিল, শ্মশান ঘাটে কোন নিয়ম নেই, রাতভর বক্স বাজছে, ওই গান শুনেছিলাম স্যারের বডি ছুঁয়ে, মনে পড়ে গেল শম্পা।

বসন্তের গান কঠিন শীতে? শম্পা বলল।

শীত নয় তো, বোধহয় ভাদ্র মাস ছিল, গুমোট রাত্রি, গঙ্গার উপরের আকাশে মেঘ চলাচল করছিল। চাঁদ ছিল ক্ষীণ। একবার তা মুখ দেখাচ্ছিল, একবার ঢেকে যাচ্ছিল মেঘে। আমার খুব ভাল মনে আছে শম্পা।

শম্পা বলল, মৃত্যু তো শীতকালই, পাতা ঝরে ওই সময়, গাছের পাতায় ধুলো আর ডিজেলকালির পরত পড়ে দ্যাখোনি, মৃত্যু কি বসন্ত হতে পারে?

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে অতীন। কথাটা বুঝতেও যেন সময় লাগল। তাকে নিশ্চুপ দেখে শম্পা বলল, আমি রেডিওতে শুনেছি, সেদিন গান শুনতে শুনতে ছোটবেলাটা মনে পড়ে গেল আচমকা, বাবা মা, দাদা, ভাই, বন্ধু, উফ, জীবন বড় অদ্ভুত।

অতুলানন্দের গান তুমি তো শোননি?

না, আমি ওঁর নামই শুনিনি।

একটা রেকর্ডের কথা আমি জানি, পরে আর বেরিয়েছিল কি না বলতে পারব না।

শম্পা বলল, থাক, আমার এখন গানের সময় নেই, দ্যাখো না যদি আমাকে শোনাতে পার, ফিয়েস্তা রেকর্ড পেয়ারটা তো রয়েইছে, না চলে চলে বুড়ো হয়ে গেছে।

অতীন দেখল ঘরের কোণে তিনি। অতি বৃদ্ধ বাতিল এক গায়কের চেহারা দেখতে পায় যেন সে। সেই যে ললিত বোস। তাঁর কয়েকটি রেকর্ড বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল একসময়। তারপরও অনেক রেকর্ড হয়েছিল। ধীরে ধীরে থেমে গিয়েছিলেন। একবার এক সভায় বুড়ো ললিত বোসকে দেখেছিল সে। সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। উত্তরে গান গাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। না পেরে চুপ করে বসে ছিলেন। বৃদ্ধের কথা মনে পড়ে অতীনের। ওই যে ললিত বোস থম মেরে বসে আছেন তার ঘরের কোণে, কত গান গেয়েছে ওই বুড়ো ফিয়েস্তা। তখন তার বিয়ে হয়নি, চাকরি নিয়ে ঘুরছে অখণ্ড মেদিনীপুরের এখানে সেখানে। সঙ্গী সেই তরুণ ফিয়েস্তা। যেন এক ফরাসি যুবক। সে বলেছিল ফ্রেদরিককে। সেও ফরাসি। ভবঘুরে তরুণ। কী সুন্দর তার চেহারা ছিল। নীল দুটি চোখ। তখন অতীন দীঘায়। একটি হোটেলে মাসকাবারি ভাড়ায় থাকে। হিপি উঠেছিল তার পাশের ঘরে। গেরুয়া বেশ নিয়ে নবীন সন্ন্যাসী, কিন্তু সঙ্গে বোদলেয়ার। মনের ভিতরে ভিক্তর উগো, পিকাসোর ছবি। রাতে ভাঙা ইংরিজিতে কথা হত। সেই ফ্রেদরিক আচমকা গেল জগন্নাথ ধাম, পুরী। তার কাছে রেখে গেল বোদলেয়ার। সেই বোদলেয়ার তার কাছে রয়েছে এখনো। সে ফরাসি জানে না। সারাজীবন বাক্স প্যাটরা নিয়ে ঘুরে শেখা হয়নি। ছেলে ভর্তি হয়েছে গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনে। তাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে। ফ্রেদরিকের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। বুড়ো ফরাসি কি কাফেতে কনিয়াকের পেগ নিয়ে বসে তার কথা ভাবছে। ইন্ডিয়ান, ইন্ডিয়ান! কী করে খুঁজে পাবে সে, আর তো ফেরাই হয়নি বঙ্গোপসাগরের তীরে। পরে দীঘা গিয়ে ফ্রেদরিকের খোঁজ করেছিল সে। না সে ফেরেনি আর। সে সাগরে সাগরে ঘুরে দেশে ফিরে গেছে হয় তো। পুব থেকে পশ্চিমে আরব সাগর গিয়েছে। তারপর ভারত মহাসাগর। এই রকম মনে হয় অতীনের। সে নিজের মত সাজিয়ে নিতে ভালবাসে। সেই তখন এই ফিয়েস্তা কত গান শুনিয়েছে। ফ্রেদরিকও শুনেছে। শচীন দেববর্মণ, নির্মলেন্দু চৌধুরী, অখিলবন্ধু ঘোষ, রাজেশ্বরী দত্ত... কত গান শুনেছিল ফ্রেদরিক ফিয়েস্তার গলায়।

শম্পা জিজ্ঞেস করে, সেই রেকর্ড নেই কেন?

কী করে থাকবে, তখন বাড়িতে গ্রামোফোন ছিল নাকি?

গ্রামোফোন! শম্পা বলে, আমার ছোটমাসির বাড়ি ছিল, মাসির বিয়ে হয়েছিল বড়লোকের ঘরে, মানে ওঁরা বিজনেসম্যান, মানিকতলার মাসি গো, কত বড় চোঙ ছিল সেই গ্রামোফোনের! কতরকম গান ছিল।

অতীনের মনের ভিতরে তখন অতুলানন্দ রায়ের গানের কথা ভেসে উঠছিল। শম্পা আর দাঁড়ায় না। সকালে কি অত সময় দিতে পারে সে? ব্রেক ফাস্ট বানাতে হবে। ছেলের ঘুম ভাঙল বলে। অতীনের আজ অফিস নেই, কিন্তু সে বেরোবে দুপুরে। কোথায় আড্ডা হবে। কেউ কবিতা পাঠ করবে, কেউ গান শোনাবে, কেউ গল্প। অতীনের চাকরি আর দু'বছর। তাদের মেয়ে বড়। বিয়ে হয়ে সিঙ্গাপুর। অতীন এই সব নিয়ে আছে। এক একটা বিষয় ওর মাথায় ঢুকলে আর নিস্তার নেই। সেই নিয়েই ও ক'দিন কাটিয়ে দেবে। যত বয়স হচ্ছে, অতীন তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা ঘামায় বেশি। শম্পা যেতে যেতে বলল, ইউ টিউব দ্যাখো, পেয়ে যেতে পারো।

ঠিক। অতীনের মনে হল সেখানে থাকবেই। কেউ না কেউ ওই গান আপলোড করে দিয়েছে। অতুলানন্দ রায় তার বাবা, যতীন বসুর কলিগ ছিল অফিসে। তার বাবার চেয়ে কম বয়স ছিল তাঁর। বাবার তখন ৪৮-৪৯ হবে, অতুলানন্দ ২৩-২৪। নতুন চাকরিতে ঢুকেছে। বাবা তার বস। বাবাকে রেকর্ড উপহার দিতে এসেছিল। কিন্তু গানটা শোনায় কী করে? তখন পাশের গুহবাড়িতে গেলেন অতুলানন্দ। তাদের গ্রামোফোনে বাজান রেকর্ডের গান এই ফ্ল্যাটের জানালায় এসে সকলে শুনল। দুটি জানালার একটিতে বাবা। হাতে পাশিং শো সিগারেট পুড়ছে। আর এক জানালায় অতীন, তার সদ্য বড় হওয়া দিদি কুহু আর মা। দিদি এখন থাকে ভোপাল। কিছুই না। অতীন তার মোবাইলে দিদিকে ডায়াল করল। দিদি তার চেয়ে বছর সাতের বড়। ভোপালেই সেটল্ড। ফোন বাজতে বাজতে থেমে গেল। আর তার কয়েক সেকেন্ড বাদেই দিদির কল, হ্যাঁ রে বাবলু, ফোন করলি তুই?

হ্যাঁ, দিদি তোর মনে আছে গান দুটো?

তার মানে?

অতুলানন্দ রায়ের কথা মনে আছে?

কুহু বলল, কে রে, নামটা শোনা শোনা মনে হচ্ছে।

মনে হল দিদি মনে করতে চাইছে না। অতীন তখন অতুলানন্দের কথা ভোপালে পৌঁছে দিতে লাগল। সেই কথা কুহু শুনতে লাগল নিস্তব্ধ হয়ে। কুহুর ছেলে থাকে মুম্বই। মেয়ে থাকে উজ্জয়িনী। কুহু উজ্জয়িনী আর মুম্বই করে বেড়ায়। অতীনের কথা শুনতে শুনতে কুহু বলে, মহাকালের প্রসাদ পাঠিয়েছিলাম, পেয়েছিলি তো, শিপ্রা শুকিয়ে যাচ্ছে রে।

অতীন বলল, শুকোবে, বয়স তো হল।

ইস, বয়স হল বললেই হবে, ওটা তো ভগবানের নদী।

সব নদীই ভগবানের, দিদি তোর মনে আছে, নদীটি গিয়াছে চলিয়া?

হুম। চুপ করে গেল কুহু। মনে হয় স্মরণ করতে চাইছে। তার কথা ছিল মহাকাল মন্দির আর শিপ্রা নদী নিয়ে। সেই শিপ্রাই কি গিয়াছে চলিয়া?

তারপর কী?

অতীন বলল, পথ পড়ে আছে ধূলায়!

কুহু বলল, ইস, আমার মনে পড়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে, তুই বলিস না, আমি ঠিক মনে করে নেব, পথ পড়ে আছে ধূলায়, ধূলায়, তাই তো, এটা কার গান, সতীনাথ?

তোর সত্যিই মনে নেই দিদি?

কুহু বলল, আচ্ছা, এমনি যদি হয় শিপ্রা নদী যদি চলে যায় আর পথ পড়ে থাকে ধূলায়, ইস, কী হবে, নদী চলে গেলে মহাকালও চলে যাবে তার পিছু পিছু, উজ্জয়িনীর দিকে কেউ ফিরেও তাকাবে না রে, সেই যে কালিদাসের উজ্জয়িনী।

কুহু নিজের কথা ছাড়া আর কারোর কথা শোনে না। কিন্তু জানা গেল সেই প্রাচীন নদী শিপ্রা ধীরে ধীরে... । মনটা খারাপ হয়ে গেল অতীনের। নিঃঝুম হয়ে বসে থাকল সে। কুহু বলল, সে মনে করে বলবে, তার মনে পড়ে যাবে ঠিক।

চার.

অতীন এমন। আর তার দিদি কুহুও অমন। কুহু যে বলল, সে ভাববে গানটির কথা আর সুর, আর গায়কের নাম, সারাদিন সে ভেবেই যাবে। তার ভিতরেও অতীনের মত খেয়াল আছে। এক একটা বিষয় নিয়ে মাথা খারাপ করা আছে। বোঝাই গেল কুহু তার মেয়ের বাড়ি উজ্জয়িনী নগরে গিয়েছিল। সেই কালিদাসের উজ্জয়িনী। মেঘদূতমের উজ্জয়িনী। দেখে এসেছে কাব্যের নদী ক্ষিপ্রা– শিপ্রার আরো বার্ধক্য। কুহু প্রথমবার যখন উজ্জয়িনী যায়, মহাকাল মন্দির দর্শন করে, তখন সে তার মাকে চিঠি লিখেছিল, মা কালিদাসের উজ্জয়িনী আছে গো, মিথ্যে নয়। ভোপালের কাছে সাঁচী স্তূপ দেখে কুহু স্তম্ভিত। ইতিহাস বইয়ে যে ছবি দেখেছিল, সেই ছবি একেবারে, কিন্তু কী বিপুল সেই স্তূপ, কী মহৎ! কুহু সাঁচীর অনতিদূরে বিদিশা ঘুরে এসে সে লিখেছিল, মা সেই বেত্রবতী নদী আছে, মিথ্যে নয়। এদিকের মানুষ ওকে আদর করে ডাকে বেতোয়া। মা সেই বিদিশা নগর আছে। তোমার মনে পড়ে মা, মেঘদূতম? মা পড়েনি, কিন্তু অতীনের দিদি কুহু তাকে পড়ে পড়ে শোনাত। কুহু সাহিত্যের ছাত্রী ছিল। কুহুর স্বামী ওইদিকের মানুষ। প্রবাসী বলত তখন। দিদির বিয়ের তো পঁয়ত্রিশ বছর হয়ে গেল। অতীনের মনে পড়ে যাওয়া কি ঝামেলা না ছিল। আহমেদাবাদ এক্সপ্রেস চেপে বিলাসপুরে গাড়ি বদলাও। বিলাসপুর থেকে ইন্দোর এক্সপ্রেস চেপে ভোপাল। সেই ভোর বেলায় পৌছনো। বিলাসপুর থেকে ভোপালের পথে কত পাহাড়, কত সুড়ঙ্গ। মনে পড়ে অন্ধকার টানেল দিয়ে ট্রেন চলেছে, চলেছে। এখন সরাসরি ট্রেন হয়ে গেছে। সোজা ভোপাল হয়ে উজ্জয়িনী পার করে ইন্দোর যায় শিপ্রা এক্সপ্রেস। বিকেলে হঠাৎ যেন খেয়াল হয় শম্পার, বলল, দিদি বলল না তো।

অতীন বলে, দিদি এখন আগের মত মনে রাখতে পারে না মনে হয়, না হলে এত সময়ে ফোন এসে যাওয়ার কথা।

রবিবারের বিকেল। তারা দু'জনে ব্যালকনিতে বসে। এই ক'দিন আগে শীত গেল। এই ব্যালকনিটা দক্ষিণের। শীতের সময় এখানে রোদ পড়ে। সূর্যের উত্তরায়ণ শুরু হতে সেই রোদ সরে যেতে থাকে। অতীনের মনে পড়ে, আগের বাড়ির এইদিকে ছিল জানালা। জানালার পরে খালি জমি। বাড়িওয়ালা রতনবাবুদেরই। তারা থাকত এক তলায়। সেই জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়ত ঘরের ভিতর। আর আসত দক্ষিণের হাওয়া। বাড়ি ভেঙে বহুতল উঠতে তারা একটি ফ্ল্যাট পেয়েছে শস্তায়। সেই জানালা আর নেই, দক্ষিণে হয়েছে ব্যালকনি। অতীনের মনে পড়ে জানালার উপরে গোটা শীতকাল নারকেল তেল রোদ খেয়ে গলত। হিমালয়া কোকোনাট অয়েল, সবুজ কৌটো আর একটি নারকেল গাছের ছবি। মা যতদিন ছিল, হিমালয়া থেকে পিওর কোকোনাট অয়েল ছিল। মা চলে যাওয়ার পর তারা নেই। নারকল তেল জমতে শুরু করত সেই কালী পুজোর পর। টলটলে আবছা বাদামি তেল ঘন হত একটু একটু করে। শীতের চিহ্ন। নারকেল তেলের কৌটো এসে বসত দক্ষিণের জানালায়। শম্পার ওসব পাট নেই। এ বাড়িতে কেউ আর চুলে তেল দেয় না স্নানের আগে। শ্যাম্পু সাবানই সব। শুনতে শুনতে শম্পা ভিন্ন কথা বলল, আমার ভিম বৈঠকা দেখা হয়নি, চল ঘুরে আসি একবার ভোপাল।

ভিম বৈঠকা পাহাড়ের গুহা। সেখানে আদি মানবের আঁকা গুহাচিত্র পাওয়া গেছে। বিয়ের পর তারা গিয়েছিল দিদির কাছে। দিদি তাদের পাঠিয়ে দিয়েছিল পাঁচমারি হিলস-এ। সেখানে, সেই শৈল নিবাসে তারা মধুচন্দ্রিমা পালন করেছিল। ভিম বৈঠকা যাওয়া হয়নি। সেই গুহাচিত্রের কথা শোনেনি তখন শম্পা।

যাব, যেতে হবে একবার। অতীন বলল। বলতে বলতে সে তার ব্যালকনি থেকে পথের দিকে তাকিয়ে দেখল বিমল বিশ্বাস। লুঙ্গি আর হাফ শার্ট, কী রকম উদভ্রান্তের মত এদিক সেদিক দেখছে। গেটের বাইরে কদম গাছের নিচে প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে একতলাবাসী নিলু রায় রাস্তা দেখছে। বিশেষত বছর পঞ্চাশের মহিলা থেকে বারো বছরের কিশোরী অবধি। মেয়ে দেখতেই বাইরে বসা নিলুর। আর ইচ্ছে হলে একে ওকে ভয় দেখান মিথ্যে কথা বলা। বিমল কিছু খুঁজছে? নীলু ওকে ডাকল, এই বিমল, এই বাঞ্চোত, কেমন আছিস রে?

কী অপূর্ব তার সম্ভাষণ। রোগা মানুষের গলার

অমর মিত্র

অমর মিত্রের জন্ম ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ আগস্ট অধুনা বাংলাদেশের সাতক্ষীরার নিকটবর্তী ধূলিহর গ্রামে। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও পারিবারিক আবহে সাহিত্য তাঁর বিচরণক্ষেত্র হয়ে ওঠে। ২০০৬ সালে *ধ্রুবপুত্র* উপন্যাসের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন অমর। এর আগে, *অশ্বচরিত* উপন্যাসের জন্য ২০০১ সালে পান বঙ্কিম পুরস্কার। অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে, শরৎ পুরস্কার (ভাগলপুর, ২০০৪), সর্বভারতীয় কথা পুরস্কার (১৯৯৮), গজেন্দ্রকুমার মিত্র পুরস্কার (২০১০)। বর্তমানে কলকাতা শহরে বসবাসরত অমর মিত্রের সাহিত্যিক জীবনের সূচনা ১৯৭৪ সালে। প্রথম উপন্যাস *নদীর মানুষ* ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয় অমৃত পত্রিকায়।

হারিয়ে একটি গান *পাসিং শো*-র কেন্দ্রবিন্দু। এই উপন্যাস একটি হারিয়ে যাওয়া গান আর হারিয়ে যাওয়া রেকর্ড নিয়ে। মানুষ তার জীবনে যা হারায় তাই বুঝি ফিরিয়ে আনতে চায় এইভাবে। একটি গান রেকর্ড করে যে গায়ক মুছে গেছেন স্মৃতি থেকে, সেই গান বুঝি ফিরে আসে গভীর রাতে, বাতাসে ভেসে কিংবা স্বপ্নের ভিতরে। আশ্চর্য এই কাহিনি যেন হারিয়ে যাওয়া জীবনেরই অন্বেষণ। আর এক অজ্ঞাতপ্রায় শিল্পীর প্রতিরোধে এই উপন্যাস পেয়েছে অনন্য এক মাত্রা। *পাসিং শো* যেন প্রবহমান জীবনের অফুরন্ত এক প্রদর্শন। *পাসিং শো* কলকাতার বিখ্যাত নাটকের দল *সায়ক* নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করছে নিয়মিত।

সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত অমরের *ধ্রুবপুত্র* খরাপীড়িত প্রাচীন উজ্জয়িনী নগরের কাহিনি– কবি কালিদাসের *মেঘদূত* কাব্যের এক বিপরীত নির্মাণ যেন। দীর্ঘ এই আখ্যান শেষ পর্যন্ত শূদ্র জাতির উত্থান ও কবির প্রত্যাবর্তনে পৌঁছয়।

আর বঙ্কিম পুরস্কারপ্রাপ্ত *অশ্বচরিত* তথাগত বুদ্ধের ঘোড়া কন্থক ও তাঁর সারথী ছন্দকের কাহিনি। লেখক ভারতীয় প্রতিবেশে জাদু বাস্তবতা ব্যবহার করেছেন এই উপন্যাসে। অনন্য ক্লাসিকধর্মী এই উপন্যাস দু'টি বাংলা উপন্যাসে এক আলাদা রীতির জন্ম দিয়েছে।

জোর খুব। মানে এখনো গত্তি আছে দেহে। আরো কিছুদিন চলবে চাকা। নিলুর ফ্ল্যাটের ব্যালকনি উত্তরে। রাস্তা দেখা যায় না। আর সেই ব্যালকনিতে তার বউয়ের আদরের অ্যালসেশিয়ান ঘুমোয়, খিদেয় কেঁউ কেঁউ করে, গর্জন করে, তার বউয়ের আদর খায় কোলে মুখ ঘষে ঘষে। উত্তরের ব্যালকনির বাইরে কুড়ি ফুট দূরে জলের রিজারভার, তারপর প্রাচীর। কুকুর ওই রিজারভারের দিকে তাকিয়ে ভরা পেটে গর্জন করে। কেউ ওদিকে গেলে লাফায়। একটু বাদে নিলু রায়ের বউ ওই কুকুর নিয়ে বেড়াতে বেরোবে। শীতের দিনে বেলা পড়তে বেরোত, গরমের সময় সন্ধের মুখে যায় কুকুর নিয়ে। কাজের মেয়ে মফিদা থাকে সঙ্গে। নিলু রায় ওই কুকুরটিকে সহ্য করতে পারে না। ভয় পায়। যত রোগা হচ্ছে নিলু, তত ভয় বাড়ছে তার। ভাল টাকা পেয়েছে রিটায়ার করে। বউ আর ছেলে মিলে কোনদিন না তাকে খাইয়ে দেয় ওই কুকুর দিয়ে। ছেলে জ্যোতিষ চর্চা করে। এখন নাকি শ্যামবাজারের কোন সোনার দোকানে বসে, মঙ্গল, বেস্পতি, শনি। নীলুই খবরটা তাকে দিয়েছিল, পরামর্শ দিয়েছিল তার ছেলেকেও ওই লাইনে ভেড়াতে পারে সে। বাজারে চাকরি নেই। সব কলকারখানা উঠে গেছে বা যাচ্ছে। সরকারও বলেছে আর চাকরি দেবে না। পেনশনই বন্ধ করে দিল বলে। অতীন যখন রিটায়ার করবে, পেনশন থাকবে না মনে হয়। ছ'মাসের ভিতর কী হয় দেখতে পাবে অতীন। খবরের কাগজ থেকে টিভি সবাই বলছে, পেনশন তুলে দিতে। অমিতাভ বচ্চন বলেছে পেনশন তুলে দিতে। প্রীতি জিন্টা, পাওলি দাম, ক্যাটরিনা কাইফ থেকে সানি লিওন, সবাই বলেছে পেনশন তুলে দিতে। গরমেন্ট এর পরে কি আর রাখতে পারে? কী অবলীলায় এই সব কথা বলে যায় নিলু। হাতে থাকে সেই খবরের কাগজ যেখানে প্রতিদিনের ক্রোড়পত্রেই থাকে বিবসনা মেয়েদের ছবি। নানা বিলিতি সিনেমা, হিন্দি বাংলা আর মালয়ালাম নায়িকাদের কত রকম ছবি, সঙ্গে বিচিত্র সব ক্যাপশন, লেখা। বাজারের তরকারিওয়ালা থেকে, মাছওয়ালা, ডিমওয়ালা, সকলেই ওই পত্রিকা নেয়। ছবি দ্যাখে। ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করা ছবি সব। নিলু সারাদিন চেটেপুটে খায়। এক একদিন তাকেও দেখায় বেরোনর মুখে। একদিন অদ্ভুত এক প্রস্তাব দিয়েছিল নিলু তাকে, বাসি কাগজ হাফ দামে তাকে দিয়ে দিতে পারে যদি সে রাজি থাকে। মেয়েছেলের ছবি নতুন পুরনোয় কিছু যায় আসে না। বিমল বিশ্বাসকে ক্রোড়পত্র দেখাচ্ছে সে। বিমল জিজ্ঞেস করছে কী যেন। নিলু বাঁদিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে সেই পথে যেতে বলল। বিমল চলে গেল। সমস্তটাই দেখল সে আর শম্পা। শম্পাকে এখন বিমলের কথা বলতে লাগল অতীন। মনে হয় সে দুষ্প্রাপ্য শাকপাতা, শেকড়বাকড় খুঁজতে বেরিয়েছে। ওই দিকে তো বড় মাঠ আছে, পুকুরও আছে একটি, কিন্তু ক্রমশ বুজে যাচ্ছে কিংবা বুজিয়ে দিচ্ছে কারা যেন। বিমল কাশী, জাহাজ, সিলেট শুনতে শুনতে আচমকা শম্পা বলল, দিদিকে ফোন কর।

ও মনে করতে পারেনি।

মনে করিয়ে দাও তুমি, বলে দাও, না হলে দিদি চেষ্টা করেই যাবে, ফল হবে না কোন, থই পাবে না কোন।

অতীনের মনে হল সেইটাই ঠিক হবে। না হলে দিদি শুধুই চেষ্টা করে যাবে। যত চেষ্টা করবে, তত মনে করতে পারবে না। এইসব স্মৃতি মাথার কোথায় যে লুকিয়ে থাকে কে জানে? তারও কি মনে ছিল অতুলানন্দের কথা? অনল চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু আচমকা নিয়ে এল অতুলানন্দকে। সেই যে, বছর পঁচিশের তরুণ, তার ভিতরে ছিল সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের মত করে গাওয়ার চেষ্টা। সেই আমলে যাঁরা গান গাইতেন, ধুতি আর কলার দেওয়া শাদা শার্ট পরতেন। হেমন্ত, সতীনাথ, মানবেন্দ্র– সকলেই। মান্না দেও নিশ্চয়। হেমন্তকে ওই পোশাকে কত ছবি দেখেছে সে *জলসা*, *উলটোরথ*, *প্রসাদ*– এই সব সিনেমা ম্যাগাজিনে। আসত তাদের বাড়ি। বিশেষত পুজো সংখ্যা। অতীনের যে কী হয়েছে আজ সকাল থেকে, আচমকা মনে পড়ে গেল চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়ের কথা। তিনি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান গাইতেন। তাঁর মতো করে পোশাক পরতেন। তাঁর গান দূর থেকে শুনলে মনে হত, হেমন্ত। পাড়ার শিবরাত্রির সমস্ত রাতের ফাংশনে তিনি বাঁধা। আর লতাকণ্ঠী, কিশোরকণ্ঠী যে ছিলেন কতজনা। সে আচমকা শম্পাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি মীরা বিশ্বাস, বুবাই বিশ্বাসের নাম শুনেছ?

মাথা নাড়ল শম্পা, না তো, তাঁরা কারা?

গান গেয়ে বেড়াতেন ওই দম্পতি, পরে খুব কষ্টে গেছে।

রেকর্ড ছিল? শম্পা জিজ্ঞেস করে। না মনে হয়, আর থাকলেও হয় তো একটা দুটো, সেভেন্টি এইট আরপিএম শুনেছি বুবাই শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, বাঁশদ্রোনির দিকে কোথায় যেন থাকতেন, আমাদের অফিসের দীপকবাবু বলেছিলেন।

শম্পা চুপ করে থাকল। অতীনও। তখন তার মনে হয়েছিল একবার দেখে আসে বুবাই মীরাকে। কিন্তু হয়নি। মাইনর সিংগার, মাইনর রাইটার, মাইনর অ্যাক্টর, সকলেরই এই অবস্থা হয়। কঠিন নৈঃশব্দের ভিতর চলে যান ধীরে ধীরে। কেউ তাদের খোঁজ রাখে না। শেষে হারিয়েই যান। অথচ তাঁরা তো কিছু দিতে পেরেছিলেন সাধ্যমত।

অতীন বলল, মীনা মুখার্জির নাম শুনেছ, লতা গান গাইতেন।

শম্পা বলে, চন্দ্রাণী মুখার্জির শুনেছি, সে ও ছিল লতার মত।

হু। অতীন চুপ করে যায়। জীবন কত দিয়েছে। জীবন নিয়েও নিয়েছে অনেক। কিছুই পড় থাকে না, কোথায় যে হারিয়ে যায় না বাজানো রেকর্ডের মত। অতীন আবার ফোন করে ভোপালে, কুহু সঙ্গে সঙ্গে ধরে, বিমর্ষ গলায় বলল, নারে ভাই, কিছুতেই মনে করতে পারলাম না, কার গান রে।

উফফ, দিদি, গানটা বাবার লেখা, গেয়েছিলেন...।

ও মা, তাই তো, ইস, কেন মনে পড়ল না, আমরা সেই জানালার ধারে দাঁড়িয়ে, আচ্ছা ও বাড়ির চম্পা, সে কোথায় থাকে জানিস?

না, ওরাই তো বাড়ি বেচে দিয়ে চলে গেছে বাইপাসের দিকে, ভেতরে কোথায়, হাটগাছিয়া হবে?

কেন রে, কলকাতা ছেড়ে কেউ গ্রামে চলে যায়, তারপর হাটগাছিয়া! কুহু বলে।

তোকে বলেছিলাম দিদি, তুই ভুলে গেছিস।

হুম, চম্পার কথাটা ওই গানের সঙ্গে ফিরে এলরে, কী বলেছিলি তুই আমাকে, ওরা তো কত বড়লোক ছিল, তখন কোন বাড়িতে গ্রামোফোন ছিল, টেলিফোন ছিল?

অভ্রর অসুখ।

অভ্র মানে ছোট ছেলেটা?

চম্পাদির পরে চামেলি আমার বয়সী, তারপর অভ্র, ওদের কাকা ছিল একজন, সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেনি, জ্যেঠার দুই ছেলে বিদেশে, শরিকি গোলমাল লেগেছিল, তারপর অভ্রর চিকিৎসার জন্য বাড়ির অংশ দিয়ে দিল বড়জনের ছেলেদের।

অভ্র কেমন আছে?

জানি না।

খোঁজ নিসনি তুই?

না দিদি, ওরা ঠিকানা দিয়েও যায়নি।

পুরো ফ্যামিলিটা হারিয়ে গেল ! বিড়বিড় করল কুহু। হ্যাঁ, একএকদিন মনে হয় ধর্মতলায় দেখা হয়ে যাবে, কিংবা হাতিবাগান বা শ্যামবাজারে, হয় না, অভ্র কিংবা চম্পাদি, চামেলি, কেউ আসে না। বলে অতীন। অতুলানন্দের গান ওদের গ্রামোফোন থেকে শুনেছিলাম রে।

হ্যাঁ, ওই রেকর্ড কি তোর কাছে আছে দিদি?

না রে, একটা রেকর্ড আমাদের দিয়েছিলেন অতুলকাকা, সেই রেকর্ড তো বাজত না, না বাজলে তার দাম কী বল, কোথায় চলে গেছে। কুহু বলল।

না, বাবা যতদিন ছিলেন, ওটা ছিল মনে হয়, তুই নিয়ে যাস নি তো বাবার স্মৃতি করে?

কুহু চুপ করে থাকল। তখন শম্পার মনে হল, এমন হতে পারে সেই যে সেই গ্রামোফোন, তার সঙ্গে চলে গেছে সেই রেকর্ড। যে বাড়িতে বেজেছিল সেই রেকর্ড, সেই বাড়ির সঙ্গে চলে গেছে সেই হাটগাছিয়া না কোথায়। এই সব ভাবতে ভাবতে শম্পা দেখল তাদের ব্যালকনির নিচে সেই লোকটা এসে দাঁড়িয়েছে আবার। তাকে ডাকছে নিলু রায়। হ্যাঁ হ্যাঁ করে হাসছে নিলু, ঘুরে এলি তো বোকাচোদা, ওই দোতলায় থাকে অতীন।

• পরবর্তী সংখ্যায়

অমর মিত্র
সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতীয় লেখক

প্রবন্ধ

উলট-পুরাণ: রাজনারায়ণ থেকে রাজশেখর

দীপক গোস্বামী

ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রসঙ্গ রাজশেখর বসুর 'পরশুরাম' ছদ্মনামে লেখা বিভিন্ন গল্পে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে। কখনো বর্ণনায়, কখনো-বা কথোপকথনের মধ্যে এগুলি খুঁজে নেওয়া যায়। কিন্তু যে সব গল্পে রাজনীতিই বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে–'উলট-পুরাণ', 'গামানুষ জাতির কথা', 'মাঙ্গলিক', ইত্যাদি–তাদের নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার সুযোগ আছে, বিশেষত 'উলট-পুরাণ'। 'উলট-পুরাণ'-এর আনুমানিক রচনাকাল ১৯২৫-২৭-এর মধ্যবর্তী কোনও সময়। এটি *কজ্জলী* গল্পগ্রন্থ (প্রকাশকাল: ১৮ অক্টোবর ১৯২৭)-এর শেষ গল্প। কিন্তু তার আগে কোনও সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা, সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। অন্তত কোনও বহুল প্রচারিত পত্রিকায় যে হয়নি, সেটা সেই সময়ের পত্র-পত্রিকা দেখলেই বোঝা যায়।

কেন হয়নি, সেটা স্বতন্ত্র অনুসন্ধানের বিষয়। রূপকের মাধ্যমে হলেও ভারতীয় উপমহদেশে ইংরেজ শাসনের কুফলগুলি এই গল্পে এত স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে প্রতিষ্ঠিত পত্র-পত্রিকাগুলি এর প্রকাশে রাজদ্রোহের আশঙ্কা অনুভব করলে অবাক হবার কিছু থাকে না। কারণ 'উলট-পুরাণ' একটি আদ্যন্ত রাজনৈতিক গল্প, আরও পরিষ্কার করে বললে– রাজনৈতিক ব্যঙ্গ গল্প। ব্যঙ্গ করা হয়েছে আগাগোড়া ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে– তার অর্থনীতি, রাজনীতি সমাজতত্ত্ব সমেত। প্রাথমিকভাবে এর আঙ্গিকে ব্যঙ্গটা এতই প্রবল ও স্পষ্ট যে তার আড়ালে প্রচ্ছন্ন সূক্ষ্ম রাজনীতিটা অসতর্ক পাঠে নজরে আসে না। কিন্তু আবার আঙ্গিকের কারণেই লেখকের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যটাও অমোঘ হয়ে ওঠে। সমালোচক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের ব্যাখ্যায়: '... যে কোনো জিনিষ নিয়ে অনেক দিন ঘর করলে তার নতুনত্ব চলে যায়। তখন আর তার সম্পর্কে কোন বিশেষ আকর্ষণ বা অনুভূতি থাকে না। এমন হয় বলেই অনেক সময় চেনা অন্যায়কে আর অন্যায় বলে মনে হয় না।... চেনাকে অচেনা করে দেখলে তবেই নতুন করে ধাক্কা দেওয়া যায়।' ভারতে ব্রিটিশ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন, ধর্ম প্রভাবিত সমাজ-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ, দল ও মত পরিবর্তন করতে সদা তৎপর শাসনকর্তাদের অনুগ্রহ-প্রত্যাশী কিছু সুবিধাবাদী, সহেবদের আচার-ব্যবহার অনুকরণের প্রাবল্য, আলোকপ্রাপ্তা মহিলাদের পুরুষ কতৃর্ত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, খাতায় কলমে স্বাধীন সামন্ত নরপতিদের অসহায়তা– এ সমস্ত কিছুই 'উলট-পুরাণ'-এর বিষয়বস্তু। কিন্তু সব কিছুই দেখানো হয়েছে উল্টো করে এবং ব্যঙ্গের মাধ্যমে। অর্থাৎ ইংরেজরা ভারতীয় উপমহাদেশ জয় করে শাসন করছে না, ভারতীয়রাই যেন বহুধাবিভক্ত ইউরোপকে জয় করে ভারতীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। আর সেটা বাস্তবের দিক থেকে সঠিক না হলেও, বিপরীত হওয়ার কারণে প্রতি মুহূর্তেই নতুন নতুন মজার সৃষ্টি হচ্ছে।

আঙ্গিকের দিক থেকে দেখলে 'উলট-পুরাণ' পরশুরামের সমগ্র রচনার মধ্যে একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। এর আগে এরকম গল্প তিনি আর একটিও লেখেননি, পরবর্তীকালেও লেখেননি অবশ্য। ইংরেজ শাসনে অভ্যস্ত বাঙালি পাঠকের কাছে defamilarization পদ্ধতিতে লেখা এই গল্প এক বিরাট ধাক্কা। তবে এই পদ্ধতি এবং গল্পের বিষয়বস্তু যে সম্পূর্ণভাবে তাঁর মৌলিক– এ রকম দাবি বোধহয় করা যাবে না। গল্পের কাঠামো তৈরিতে অন্তত অন্য আর একটি বাঙলা রচনার প্রভাব স্বীকার করতেই হয়, সেটি রাজনারায়ণ বসুর একটি রূপক– 'আশ্চর্য্য স্বপ্ন'। রূপকটি নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *প্রতিধ্বনি* পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে রাজনারায়ণের প্রবন্ধ সংকলন *বিবিধ প্রবন্ধ*-এ এটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

রবীন্দ্র-রচনার সূত্রে এবং *সে কাল আর এ কাল* বইয়ের অনুষঙ্গে রাজনারায়ণ বসু বাঙালি পাঠকের কাছে ততটা অপরিচিত না হলেও আজকের পাঠক যে তাঁর সম্পর্কে সম্যক অবহিত– এটাও মনে হয় না। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ সেপ্টেম্বর (২৩ ভাদ্র ১২৩৩) দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বোড়াল গ্রামে রাজনারায়ণের জন্ম হয়। গ্রামে গুরুমশায়ের কাছে রাজনারায়ণের শিক্ষা শুরু। পরে হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্তি হন, তখন যার নাম ছিল School Society's School। ১৮৪০-এ হেয়ার স্কুল থেকে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ক্যাপ্টেন ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন তখন সেখানকার অধ্যক্ষ। কলেজে সমস্ত সময়েই ছাত্রবৃত্তি পেয়েছেন এবং সহপাঠী হিসেবে পেয়েছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখদের। তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়ে কিছুদিন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপনিষদ ব্যাখ্যার ইংরেজি অনুবাদক হিসেবে তত্ত্ববোধিনী সভায় কাজও করেছেন। ১৮৫১ সালে রাজনারায়ণ মেদিনীপুর সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব নেন এবং পরবর্তী আঠারো বছর এই স্কুলের প্রভূত উন্নতি করে তাঁর শিক্ষাব্রতী জীবন শেষ করেন। এখানে যোগ দেবার পরে তাঁর প্রচেষ্টায় এই স্কুলের রূপও বদলে যায়। ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে সাহিত্যবিষয়ক আলোচনার জন্য বিতর্কসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ছাত্র ও শিক্ষকদের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত দরিদ্র ভান্ডারের মাধ্যমে বৃদ্ধ অসুস্থ শিক্ষক/শিক্ষাকর্মীরা সাহায্যের সুযোগ পান।

শুধু এই স্কুলই নয়, তিনি নিজেকে মেদিনীপুরের সঙ্গে এমনভাবে একাত্ম করে ফেলেছিলেন যে লোকে তাঁকে মেদিনীপুরের রাজনারায়ণ বসু বলেই জানত। সেখানে তিনি শ্রমজীবী মানুষদের জন্য সান্ধ্য বিদ্যালয় চালু করেছিলেন এবং মহিলাদের শিক্ষার জন্যও আর একটি বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছেন। তাঁর উদ্যোগে মেদিনীপুরের পাবলিক লাইব্রেরি শুরু হয় এবং তাঁরই চেষ্টায় একটি ব্রাহ্মসমাজ গৃহ ও ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক নিপীড়ন সহ্য করেও তিনি এখানে ১৮৬১ সালে সুরাপান নিবারণী সভারও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মনে রাখতে হবে কলকাতায় প্যারীচরণ সরকারের বহু আলোচিত সুরাপান নিবারণী সভার প্রতিষ্ঠা হতে এখনও দু' বছর দেরি আছে। রবীন্দ্রনাথ রাজনারায়ণকে 'চিরবালক' বলে উল্লেখ করেছেন এবং লক্ষ করেছেন: 'তাঁহার বাহিরের প্রবীণতা শুভ্র মোড়কটির মতো হইয়া তাঁহার অন্তরের নবীনতাকে চিরদিন তাজা করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল... একদিকে তিনি আপনার জীবন এবং সংসারটিকে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন, আর–একদিকে দেশের উন্নতিসাধন করিবার জন্য তিনি সর্বদাই কতরকম সাধ্য ও অসাধ্য প্ল্যান করিতেন তাহার আর অন্ত নাই।

দুই.

রাজনারায়ণের অজস্র কর্মকাণ্ডের মধ্যে তখনকার পরাধীনতার হীনাবস্থা সম্পর্কে বাঙালিকে সচেতন করে ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার যে চেষ্টা– সেটা আলাদাভাবে উল্লেখ করা উচিত, বিশেষত তাঁর প্রতিষ্ঠিত *সঞ্জরিণী সভার* কথা। কারণ এগুলিই হয়তো 'আশ্চর্য্য স্বপ্ন' লেখার প্রাথমিক ভিত্তি। এ প্রসঙ্গে যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন: 'জাতীয় গৌরব-সম্পাদনী সভার অপর নাম জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চরিণী সভা। রাজনারায়ণ এই সভাটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।' অন্যত্র তিনি লিখেছেন: '১লা জানুয়ারির পরিবর্তে আমাদের চিরন্তন নববর্ষ ১লা বৈশাখে উৎসব পালন, লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হইলে 'good mornign', 'good evening'-এর পরিবর্তে আমাদের সনাতন নমস্কার প্রণামাদির পুনঃপ্রচলন, কথোপকথনে বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা প্রবর্ত্তন ইত্যাদি এই সভার প্রারম্ভিক কার্য্য ছিল।'

রাজনারায়ণ তাঁর রচনা, বক্তৃতা, সাংগঠনিক কর্মদক্ষতা– সবকিছু দিয়েই পরনির্ভরশীল অনুকরণপ্রিয় বাঙালিকে তাঁর নিজস্ব সত্তায় ফিরে আসতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বাঙালি কতটা অনুকরণপ্রিয় ও পরনির্ভর হয়ে পড়েছে, তা নিজেরাই বুঝতে পারত না। পরিহাসছলে সেখানে আঘাত করার উদ্দেশ্যে তিনি 'আশ্চর্য্য স্বপ্ন' রূপকটি মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে পাঠ করেন। আমরা সংক্ষেপে তার বক্তব্যটা দেখে নেব।

ঘুমের আগে রাজনারায়ণ বর্তমান বাংলা দেশের দুরবস্থা এবং অতীতে, বিশেষত পাল রাজবংশের শাসনকালে যখন তিব্বত থেকে কর্ণাট পর্যন্ত বাঙালির অধীনে এসেছিল, তার কথা চিন্তা করতে করতে ঘুমের মধ্যে এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলেন। মনে হল, বাংলা দেশ স্বাধীন হয়েছে এবং কয়েক বছরের মধ্যে এতটাই সুসভ্য হয়ে উঠেছে যে প্রথিবীর কোনো দেশই তার সমকক্ষ নয়। বাঙালি ইংলন্ড জয় করে তার শাসনের জন্য একজন ভাইসরয়ও নিযুক্ত করেছে। বাঙালির অধীনে ইংলন্ডেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন সেখানকার স্কুলে প্রধানত বাংলা ও সংস্কৃতের আলোচনা হয়, অক্সফোর্ডের পণ্ডিতরাও তসরের জোড় পরে টিকি রেখে নস্যির ডিব থেকে নস্যি নিয়ে সংস্কৃত পড়ান। কলেজে বিদ্যাপতি কবিকঙ্কণ পড়ানো হচ্ছে এবং ইংরেজ অধ্যাপকরা তার নোট-বই প্রকাশ করছেন। লোক বাংলায় কবিতা লিখছে। মদ ও মাংস সবাই পরিত্যাগ করেছে– খেলেও পাঁঠা এবং মাছ খাচ্ছে। পিক্‌ল আর সসের পরিবর্তে আমের আচার ও কাসুন্দি ব্যবহার করছে এবং তেল-নুনে জারানো কই মাগুর মাছ বাংলা থেকে রপ্তানি হচ্ছে। সাহেবরা আমাদের মতো গায়ে তেলমাখা ও হুঁকায় তামাক খাওয়া অভ্যাস রপ্ত করেছেন। শীতে কষ্ট হলেও সাহেবদের বেশিরভাগই ধুতি চাদর পিরান পরছেন, আর মহিলারাও গাউনের চেয়ে শাড়ি বেশি সৌন্দর্য বাড়ায় মনে করে শাড়ি পরা ধরেছেন। সাহেবরা কোনদিনই ক্রমবর্ধমান স্ত্রী স্বাধীনতায় খুশি ছিলেন না। এখন তাঁরা বাঙালিদের মত মেমসাহেবদেরও অন্তঃপুরে রাখার ব্যাপারে সচেতন হয়েছেন। সকলে মৃতদেহ সমাধি দেওয়ার পরিবর্তে দাহ করার প্রথা চালু করেছে। কিছু ইংরেজ, যাঁরা জ্ঞান ও ধর্মচর্চায় নিযুক্ত আছেন, বাঙলার রাজা তাঁদের নিয়ে এক শ্বেতদ্বীপী-ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের উপবীতও দেওয়া হয়েছে। তাঁর রাজ্য পরিদর্শনের জন্য এবার বঙ্গরাজ নিজেই ইংল্যান্ড এসেছেন। যেদিন তিনি এলেন তাঁকে সংবর্ধনার জন্য সুসজ্জিত রাস্তায় জনস্রোত প্রবাহিত হতে লাগল। তাদের কলরবেই রাজনারায়ণের ঘুম ভেঙে গেল।

রূপকটি এইখানেই শেষ। খুবই সহজ সরল পদ্ধতিতে বাঙালিকে সচেতন করার এক প্রয়াস করেছেন রাজনারায়ণ। ইচ্ছাপুরণ হোক বা না-ই হোক স্বপ্ন দেখতে কারো বাধা নেই। সেই কারণেই তিনি সর্বদা বাঙালির হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনার যে স্বপ্ন দেখতেন, সেই স্বপ্ন তখনকার সামাজিক ছবিটিকে বিপরীত করে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। গল্পটি থেকে এর চেয়ে বেশি সাহিত্যিক প্রয়াস খোঁজার কোন অর্থ হয় না– রাজনারায়ণের নিজস্ব বিশ্বাস ও আন্তরিকতায় প্রতি কোন সন্দহ না রেখেও।

তিন.

অপর দিকে 'উলট-পুরাণ'-কে পরশুরামের ব্যতিক্রমী প্রয়াস বলা হলেও, ব্যতিক্রম মূলত আঙ্গিকে এবং কাহিনির ব্যঙ্গকে চূড়ান্ত স্তরে নিয়ে যাবার জন্য ডিফেমিলারাইজেসন পদ্ধতির প্রয়োগ। না হলে সমসাময়িক ঘটনাকে ব্যঙ্গের মোড়কে পরিবেশন করার পরশুরামী-প্রতিভা গল্পটির ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে। এখানে কোন ন্যারেটিভের মাধ্যমে পরিষ্কার গল্প তৈরি করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। বরং বিচ্ছিন্ন কথোপকথন, বক্তৃতা, সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন, প্রতিবেদন বা সম্পাদকীয় ইত্যাদির মাধ্যমে একটি সময়কে তুলে ধরেছেন যেখানে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি আমাদের পরিচিত, কিন্তু যে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে সেগুলো ঘটছে বাস্তবের সঙ্গে তাদের মিল না থাকায় বা স্পষ্ট করে বললে বাস্তবের বিপরীত হওয়ায়, এক অদম্য ব্যঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে।

গল্পটা এমন একটা সময়ে, যখন প্রবল পরাক্রান্ত ভারত সরকারের দোর্দণ্ডশাসনের সুশীতল ছায়ায় ইউরোপ শাসিত হচ্ছে। ইউরোপের লোকেদের ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে– লোভ কমছে, বিলাসিতা দূর হচ্ছে, ইহকালের ওপর আস্থা কমে পরকালের ওপর নির্ভরতা বাড়ছে। আর এ সব কথাই সেখানকার ছাত্রছাত্রীরা সরকারের হুকুমে ছাপার অক্ষরে পড়ছে, যাতে তারা বড় হয়ে শান্ত বাধ্য রাজভক্ত প্রজা হতে পারে। তারা সামাজিক অনুষ্ঠানে ভারতীয় পোশাক পরছে– বিশেষত শীতের দেশে ঠাণ্ডা লেগে অসুখ হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও বাঙালির মতো ধুতি-পাঞ্জাবি, কারণ বাঙালিই সব চেয়ে সভ্য।

নিজেদের মুখপত্রে ব্রিটিশ ধর্মযাজকেরা ঘোড়দৌড় বন্ধ করার জন্য আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। কারণ রেস খেলা ব্রিটিশ-জাতির সনাতন ধর্ম এবং লোকাচার বাইবেলেরও ওপর। এর ওপর শীঘ্রই মদ্যপান রোধের উদ্দশ্যেও আইন হবে শুনে তাঁরা শঙ্কিত হচ্ছেন– তা হলে কি তাঁদের সনাতন পানীয় বন্ধ করে ভারত সরকার এবার তাঁদের ভারতীয় চা-এর কাটতি বাড়াবেন!

ব্রিটিশ নাগরিক মিস্টার গবসন টোডির খাঁসাহেব উপাধি লাভে ভারতমনা ইংরেজি সংবাদপত্র তাঁর অভিনন্দন জানিয়েছে, কারণ তিনি অতি উপযুক্ত ব্যক্তি। কিন্তু গবসন টোডির বাড়ির অন্দরমহলে তাঁর দুই মেয়েকে নিয়ে বাঙালি শিক্ষয়িত্রী জোছনাদি আর পেরে উঠছেন না। ছোটটি দিন দিন বেয়াড়া হয়ে যাচ্ছে। সে ভারতীয় আদবকায়দা কিছুই শিখতে চায় না। বড়টি সে-সব ব্যাপারে বাধ্য হলেও তার বাংলা উচ্চারণ খুব খারাপ, সে বাংলা উপন্যাস পড়েও বুঝতে পারে না। জোছনাদি বলেন যে উপন্যাসের অর্থ বোঝার কোন দরকার নেই। শুধু কিছু বাছা বাছা জায়গা মুখস্থ করে লোককে জানান চাই যে বাংলা ভাল বই-এর সঙ্গে তার পরিচয় আছে। জিভের জড়তা ভাঙার জন্য তিনি চকোলেটের পরিবর্তে ছোলাভাজার ব্যবস্থা করেন– অভ্যাস করার জন্য কিছু দাঁতভাঙা শব্দ বলে দেন। পাশ্চাত্য ভদ্রতাবোধে মিসেস টোডির কথায় কথায় থ্যাংক ইউ, প্লিজ, সরি বলার অভ্যাসে জোছনাদি আপত্তি করেন– তুচ্ছ কারণে কৃতজ্ঞতা বা দুঃখ প্রকাশ ভারতীয়রা ভণ্ডামি বলে মনে করে। স্বামীকেও নাম ধরে ডাকতে বারণ করে দেন। অন্যদিকে, পোশাক কার্পেট টেবিল ক্লথ

নোংরা না করে ভারতীয় পদ্ধতীয় পদ্ধতিতে আম খাওয়ার জন্য মিস্টার টোডি বাথরুমের মত নিরাপদ জায়গাই বেছে নেন।

সংবাদপত্রে দাঁত শক্ত করার জন্য বাঙালি মেয়ের নিজ হাতে গড়া আনন্দনাড়ুর এবং মেমদের সাদা ফ্যাকাশে রংকে বাঙালি মেয়ের মত শ্যামলা করার জন্য আম্বুরী বরুণ (Burnt umbre)-এর মত আশ্চর্য গুঁড়ার বিজ্ঞাপন বার হয়। ব্রিটিশ জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র মারফৎ জানা যায় ভারতের দ্বারা ইউরোপের শোষণ অবিরাম গতিতে চলছে। ফলে সেখানে অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, বীফ নেই, মাখন নেই– এবার বিয়ারও বন্ধ হবে। ব্রিটেনের বাণিজ্যিক ফসল ও প্রাণীদের ভারতে পাঠিয়ে প্রক্রিয়াকরণের পর আবার পাশ্চাত্যেই রপ্তানি করা হচ্ছে। সাহেবদের বিয়ার হুইস্কির পরিবর্তে ভারতের গাঁজা আফিমের অভ্যাস করানো হচ্ছে। আগামী আশ্বিন মাসে এই লন্ডন শহরে এক বিরাট রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করা হচ্ছে– দু'মাস ধরে দীয়তাং ভুজ্যতাং চলবে, কিন্তু তার খরচ যোগাতে হবে গরিব ইউরোপবাসীকেই। ঠিক ঐ সময়েই হাগ শহরে প্যান-ইউরোপিয়ান লিবার্টি লীগেরও অধিবেশন হবে। জাতীয়তাবাদী ব্রিটিশ সংবাদপত্র আবেদন করেছে যাদের বিন্দুমাত্র আত্মসম্মান বোধ আছে তারা যেন রাজসূয় যজ্ঞের ত্রিসীমানায় না গিয়ে সর্বরাষ্ট্রীয় মহাসম্মেলনেই যোগ দেয়।

হাইড পার্কের বক্তৃতা মঞ্চে তিন হাজার শ্রোতার সামনে বক্তৃতা দিতে উঠে সুবিধাবাদী তুখোড় বক্তা সার ট্রিক্সি টার্নকোট সরকারের তীব্র সমালোচনা করতে থাকেন। বক্তৃতার মাঝেই এক বন্ধু চুপিচুপি জানান যে ট্রিক্সি নিজের সর্বনাশ করছেন, কারণ চিল্টার্ন হানড্রেডস-এর দেওয়ানিটা ট্রিক্সিকে দেবার ব্যাপারে বিবেচনা করা হচ্ছে, এখুনি তার খবরও আসার কথা। ট্রিকসি কথার মারপ্যাঁচে এতক্ষণের বক্তব্যের উল্টো যুক্তি উপস্থিত করে বক্তৃতা চালিয়ে যান। শ্রোতারা বিস্মিত হয়ে ট্রিক্সির দিকে পচা ডিম বাঁধাকপি ছুঁড়তে থাকে, সভায় বেড়াল ডাক ওঠে। কিন্তু খবর আসে দেওয়ানিটা ট্রিকসি পাননি। দক্ষ খেলোয়াড়ের মত আবার উল্টো ট্রাপিজে ভর করে ট্রিক্সি সরকারি বিরোধিতায় চলে যান। শ্রোতারা বক্তার জয়ধ্বনি করতে থাকে।

নারীজাতির মুখপত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে হাজার হাজার বছর ধরে নারীদের ওপর পুরুষের কর্তৃত্বের প্রতিবাদে এবার নিখিল ব্রিটিশ নারীবাহিনী শোভাযাত্রা করে অকর্মণ্য পুরুষদের তাড়িয়ে দিয়ে সরকারের কাছ থেকে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য পার্লামেন্ট আক্রমণ করবে। পুরুষজাতির মুখপত্র মারফৎ জানা যায় নারীরা তাদের সেই শোভাযাত্রার মাধ্যমে প্রকাশ্য দিনের আলোয় পুরুষদের ওপর বিষম অত্যাচার করেছে, অথচ সরকারের প্রিয় উড়িয়া-পুলিশ এই হাঙ্গামা থামানোর পরিবর্তে একগাল পান মুখে পুরে নারীদেরই উৎসাহিত করেছে। আর এই সুযোগ ভারতমনা ইংরেজি সংবাদপত্র স্বাধীনতাকামী ইংরেজদের ব্যঙ্গ করে বলেছে– তোমরা আগে একটু সভ্য হও, তারপর স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখ।

রাজসূয় যজ্ঞের জন্য উৎসাহ ও প্রস্তুতি ইউরোপের সব রাজ্যেই শুরু হয়ে গেছে। জার্মানির এক সামন্ত রাজ্য ভোমস্টাট-এও তার অন্যথা হয়নি। যদিও ভারতীয় শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সমস্ত ইউরোপ জুড়ে যে অসন্তোষ আর চাঞ্চল্য দেখা যায়, এখানে সাধারণ মানুষের মধ্যে তার খুবই অভাব। কারণ সব রকম গোলাযোগ উচ্ছেদ করার জন্যই এখানকার স্বাধীন নরপতি প্রিন্স ভোম সকলের মৌতাতের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন– ভারতে উৎপাদন করা গুলি খেয়ে রাজ্যসুদ্ধ সব ভোম হয়ে আছে। এই প্রিন্সের কাছেই সার ট্রিক্সি প্যান-ইউরোপিয়ান লিবার্টি লীগের অধিবেশনের সভাপতি হবার জন্য আমন্ত্রণ নিয়ে আসেন। প্রিন্স তো এ রকম রাজদ্রোহমূলক কাজের কথা ভাবতেই পারেন না। তখন তাঁর কাছে রাজসূয় যজ্ঞে না যাবার অনুরোধও করা হয়। কিন্তু সেটাই-বা কি করে সম্ভব! অগত্যা সার ট্রিক্সিকে হতাশ হয়েই ফিরতে হয়।

রাজসূয় যজ্ঞ সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী ব্রিটিশ সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে জানা যায় যে দু'মাস ধরে হরতালের মধ্যে রাজসূয় যজ্ঞ শেষ হয়েছে। জনকতক ধামাধরা ছাড়া ইউরোপের জনসাধারণ এই অনুষ্ঠান বর্জন করে আত্মসম্মান রক্ষা করেছেন। কিন্তু ভারতমনা ইংরেজি সংবাদপত্রের প্রতিবেদক জানান যে তথাকথিত দেশনায়কদের কলা দেখিয়ে ইউরোপের জনসাধারণ রাজসূয় যজ্ঞে যোগ দিয়ে অশেষ আনন্দ লাভ করেছে। এই উপলক্ষে যাঁরা সরকারকে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে ট্রিক্সি টার্নকোটের নাম উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ মেষবংসের উৎকর্ষ সাধনের জন্য যে সরকারি কমিশন তৈরি হয়েছে, শোনা যাচ্ছে তার প্রেসিডেন্টরূপে সার ট্রিকসি শীঘ্রই কামরূপ যাচ্ছেন।

চার.

এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে রাজনারায়ণের সংক্ষিপ্ত সরল বক্তব্যের পাশে পরশুরামের দুর্দান্ত স্যাটায়ার-সমৃদ্ধ গল্পটির উজ্জ্বলতায় স্বাভাবিকভাবেই চোখ আটকে যায়। বিভিন্ন তলে বিভক্ত গল্পটি ঘটনার ব্যাপ্তি ও বর্ণনার মৌলত্ব অজান্তে পাঠককে গ্রাস করে ফেলে– হয়তো-বা ফিরে ফিরে পড়তে হয়। তবুও কোথাও যেন এ কথাও মনে হয় যে রাজনারায়ণের কাছে পরশুরামেরও কিছু ঋণ রয়ে গেছে। সম্ভবত তাঁর রূপকের বীজ থেকেই পরশুরামের গল্পের মহীরুহ ডালপালা মেলেছে। রাজনারায়ণ বহুলপঠিত গল্পকার ছিলেন না (হয়তো হতেও চাননি)। বিগতমহিমা বাঙালির অতীত ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারের ইচ্ছায় তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গল্প নিয়ে নানা সময় পাঠকের কাছে উপস্থিত হয়েছেন। 'আশ্চর্য স্বপ্ন'-ও সেই রকম এক রচনা এবং *বিবিধ প্রবন্ধ*-এর অন্তর্গত হওয়ায় এটি অনেকের পড়ার সুযোগ হয়ে গেছে। তবু ইন্টারটেক্সচুয়ালিটির তত্ত্ব অনুযায়ী দুটি গল্পে কাহিনিগত সাদৃশ্য খোঁজবার আগে আমরা চারটি বিষয় দেখে নেব।

প্রথমত, রাজনারায়ণের গল্পটি স্বপ্নভিত্তিক। স্বপ্নে যা ইচ্ছা দেখা যেতে পারে– ইচ্ছাপুরণও হতে পারে। আমরা আপাতত স্বপ্নের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না। কিন্তু স্বপ্ন বলেই বলেই এখানে বাস্তবের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক দূরত্বও তৈরি হয়ে যাচ্ছে। শুরু থেকেই পাঠক ন্যারেটিভকে স্বপ্নের প্রেক্ষাপট থেকেই বিচার করবেন। অর্থাৎ সবকিছু বিপরীত করে দেখানোয় যে মজাটা তৈরি হচ্ছে, স্বপ্নের পটভূমিকা তার অনেকটাই শোষণ করে নেবে। অপর দিকে, পরশুরাম ব্যঙ্গের তীব্রতাকে প্রকাশ করার জন্য সব কিছুই সরাসরি বলছেন। এমন কি, গল্পের নাম ছাড়া আর কোথাও বিপরীত প্রয়োগের উল্লেখও করা হয়নি। ফলে প্রত্যেকটি ঘটনার, সম্পাদকীয়ের, সংলাপের বা প্রতিবেদনের ব্যঙ্গ পাঠককে সরাসরি এসে আঘাত করে।

দ্বিতীয়ত, বাঙালির হৃতগৌরবের প্রেক্ষাপটের ওপর রাজনারায়ণ তাঁর গল্পকে দাঁড় করিয়েছেন। অবিভক্ত ভারতের একটি প্রদেশ হিসাবে বঙ্গদেশ সুদূর ইউরোপের একটি দেশ ইংল্যান্ড জয় করল, এটা স্বপ্নেও ধারণা করা সহজ নয়। ভারত ও ইউরোপের স্বাভাবিক রাজনৈতিক বাস্তবতা প্রতি মুহূর্তেই এটির বিপরীত কথাই বলবে। হয়তো সেই কারণেই পরশুরামের গল্পে বঙ্গদেশ এবং ইংল্যান্ড যথাক্রমে ভারত ও ইউরোপ হয়ে গেছে। আপাত অবাস্তব বিপরীত বর্ণনা সত্ত্বেও পরশুরাম অন্তত যুক্তির বাস্তবতাকে ক্ষুণ্ন করেননি। আর সেই বাস্তবতার মশলাতেই তাঁর ব্যঙ্গের আতসবাজি ক্রমাগত ফাটতে শুরু করেছে।

তৃতীয়ত, বর্ণনায়, বিশেষত পরিভাষা হিসাবে এদেশীয় শব্দের ব্যবহার পরশুরামকে বিপরীত পরিবেশ তৈরিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। রাজনারায়ণ ইংল্যান্ডের ভারতীয় শাসনকর্তা হিসাবে 'বাঙালী বাইস্‌রয়' (Viceroy)-এর উল্লেখ করেছেন। এতে অর্থটা সহজে বোঝা যায় বটে, কিন্তু বিজেতা দেশ হিসাবে বাঙালির কর্তৃত্ব ততটা প্রকাশ পায় না, যতটা পায় পরশুরামের 'মহাক্ষত্রপ' বা 'ক্ষত্রপ' শব্দের ব্যবহারে। এ ছাড়াও ব্যঙ্গার্থে মেডিটেরেনিয়ানকে মেতিপুকুর বা আলস্টারকে বেলেস্তারা কিংবা ম্যাঞ্চেস্টারকে নিম্‌তে এবং সঙ্গে নিখিল ব্রিটিশ নারী বাহিনি, জগঝম্প, ভারতীয় কায়দায় লোকজনের সঙ্গে মোলাকাত– সব মিলিয়ে ভারতের ইউরোপ বিজয় (প্রকৃতপক্ষে না হলেও) আপাতদৃষ্টিতে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে।

চতুর্থত, রাজনারায়ণের গল্প সম্পূর্ণ বর্ণনাত্মক। পরাধীন ভারতের দুর্দশার সমাজচিত্র কোনও নামধাম ছাড়াই কেবলমাত্র বিপরীতভাবে বর্ণনা করে গেছেন তিনি। কিন্তু পরশুরাম ভিন্নতর যে আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন, সেখানে ব্যঙ্গের প্রয়োজনে কথপোকথন, ভাষণ, বিজ্ঞাপন, প্রতিবেদনে সবই আছে এবং সেগুলিকে উপস্থিত করার জন্য অজস্র নামবাচক শব্দও ব্যবহার করতে হয়েছে। আর ব্যঙ্গাত্মক নামকরণে পরশুরামের যে মৌলিকত্ব, তারও পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেছেন এখানে এবং সেগুলিও গল্পের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে যথেষ্ট।

রাজনারায়ণ এবং পরশুরামের গল্পদুটি শুরুই হয়েছে যথাক্রমে ইংল্যান্ডের স্কুল-শিক্ষার বর্ণনা এবং ক্লাশে শিক্ষক-ছাত্রের কথোপকথন দিয়ে। স্বপ্নে দেখা তখনকার ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার কথা রাজনারায়ণ বিস্তারিত করে বলেছেন, যার মধ্যে অক্সফোর্ডের অধ্যাপকদের নস্যি নিয়ে ছাত্রদের সংস্কৃত পড়ানো থাকে শুরু করে বাংলা ভাষায় কবিতা রচনা, বিদ্যাপতি কবিকঙ্কণের কবিতা পাঠ্য হয়ে যাওয়া, ইংরাজ শিক্ষকদের সেই সব পাঠ্যবই-এর নোটবই প্রকাশ করা, ইত্যাদি অনেক কথাই আছে। সিবালিয়র বুনসেনের মত অনুসারে ওদেশের শিক্ষাবিদরা এখন বুঝতে পেরেছেন যে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক অনেক তত্ত্বই হিন্দু পুরাণে রূপক হিসাবে অবস্থান করছে। পরশুরাম এত সব বর্ণনার পরিবর্তে শুধুমাত্র শিক্ষক-ছাত্রদের কথোপকথনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন পরাধীন ভারতবর্ষের পাঠ্যপুস্তকে ইংরেজের মহিমাকীর্তন করে যে মিথ্যাচার করা হত, বিপরীতভাবে সেই একই মিথ্যাচার ভারতীয় শাসক সম্প্রাদয়ও বিলিতি পাঠ্যপুস্তকে করছেন।

মদ্যপান বন্ধের কথা– দুটি লেখাতেই আছে। তবে রাজনারায়ণ যেখানে ইংল্যান্ডের সম্ভ্রান্ত লোকেদের দিয়ে মদ্যপান পরিত্যাগ করিয়েছেন, পরশুরাম সেখানে শুধু আইন মদ্যপান রোধের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে মদ্যপান বিরতির গুণকীর্তন পড়ে সম্ভ্রান্ত ব্রিটেনবাসীরা মদ খাওয়া ছেড়ে দিলেন, বাস্তবে এটা ঘটা সম্ভব নয়। পরশুরাম সেখানে আইনের পথ ধরেছেন এবং সে আইনও সম্ভাবনার স্তরে আছে। এর পেছনের যুক্তিটি ব্যঙ্গাত্মক হলেও বাস্তব। যেহেতু গ্রেট ব্রিটেনই ভাল ভাল হুইস্কির উৎপাদক, তাই সেইসব উৎপাদন বন্ধ করে ভারত সরকার একদিকে ভারতের চা-এর কাটতি বাড়াবেন অর্থাৎ অর্থনীতির সূত্রে চা-এর বাজার তৈরি হবে এবং অন্যদিকে ভারতের গাঁজা আফিম রপ্তানি করে ব্রিটেনবাসীদের নেশাগ্রস্ত করে রাখবেন।

পরাধীন ইংল্যান্ডে ভারতের দেশীয় খাবার রপ্তানির কথা রাজনারায়ণ লিখেছেন। যার ফলে ইংরেজরা তাদের 'পিক্‌ল' ও 'সস্‌'-এর পরিবর্তে এখন আমের আচার ও কাসুন্দি ব্যবহার করছে। ভারতের কই মাগুর মাছও সংরক্ষণ করে ওদেশে পাঠানো হচ্ছে। পরশুরাম ওদেশের সংবাদ-মাধ্যমে থেকে বাঙালি খাবার 'আনন্দনাড়ু'-র বিজ্ঞাপন ব্যবহার করেছেন, যা 'যন্ত্রদ্ধারা স্পর্শিত নহে। বাঙালী মেয়ের নিজ হাতে গড়া'। বিজ্ঞাপনেও বিপরীত কথা আর সেখানেই কৌতুক!

রাজনারায়ণ স্বপ্নে দেখেছেন যে দার্শনিক লর্ড মনবড্ডো-র রীতিতে সাহেবরা গায়ে 'তৈলমর্দন আরম্ভ করিয়াছেন' এবং চুরুট ছেড়ে দিয়ে হুঁকায় তামাক খাচ্ছেন। নেশার প্রসঙ্গে পরশুরাম মিসেস টোডিকে পান খাওয়ার অভ্যাস করিয়েছেন। সিগারেট তিনি এখনও খান। তাই জোছনাদি তাঁকে সিগারেট ছেড়ে দোক্তা অভ্যাস করার পরামর্শ দিচ্ছেন। তার জন্য যে কারণ দেখিয়েছেন তাও কম ব্যঙ্গাত্মক নয়। ভারতীয় প্রথায় আম খাওয়া অভ্যাস করতে গিয়ে খাঁসাহেব টোডির দুর্দশাও বেশ সরস।

পোশাক প্রসঙ্গেও 'আশ্চর্য্য স্বপ্ন'-এর সঙ্গে 'উলট-পুরাণ'-এর যথেষ্ট মিল আছে। গল্পের শুরতে রাজনারায়ণ অক্সফোর্ডের পণ্ডিতদের তসরের জোড় পরিয়েছিলেন। পরে তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে অধিকাংশ লোক ধুতি চাদর পিরান পরে শীতে হি হি করছে, তবুও সুসভ্য পোশাক মনে করে সেই পোশাকই পরছে। পরশুরামও পাঠশালার ছাত্র টমকে স্কিপিং রোপের মত কাছা দিয়ে এই বাঙালি পোশাকই পরিয়েছেন। সাহেবদের কাছে হাত দিয়ে খাবার খাওয়ার মত অনভ্যস্ত ইংরেজ বালকের পক্ষে এই পোশাক সামলানোও যথেষ্ট কঠিন। তার ওপর ইংল্যান্ডের শীতে পাতলা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে ঠাণ্ডায় টমকে 'বু-হু-হু-হু–' 'ব্র র্‌ র্‌ র্‌' ইত্যাদি শব্দ করতে হয়। তবু বাঙালিই সবচেয়ে সভ্য তাই এই পোশাক ছাড়া গতি নেই। পণ্ডিতমশায় তাকে বাড়ি গিয়ে একটা শাল মুড়ি দিতে বলেন।

গল্পে স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রসঙ্গ দুই লেখকই এনেছেন। তবে একেবারে বিপরীতভাবে। রাজনারায়ণ দেখেছেন– 'বিবিদিগকে আর বাহিরে যাইতে দেওয়া হয় না, তাঁহারা সাটী পরিধান করিয়া অন্তঃপুরে বসিয়া আছেন। তাঁহারা গাউন অপেক্ষা সাটীকে সৌন্দর্য্য সাধক জ্ঞান করিতেছেন।' শাড়ি অথবা গাউন– কোনটা বেশি সুন্দর সেটা নেহাতই আপেক্ষিক ব্যাপার। কিন্তু চিরকাল যারা ঘরের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের জগতে বিচরণেও যথেষ্ট অভ্যস্ত, তাদেরকে অন্তপুরে বসিয়ে রাখা কার্যত সম্ভব কি? ফলত পরশুরামের অবস্থান এর বিপরীত মেরুতে। তিনি ভালই জানতেন, স্ত্রী-স্বাধীনতা পুরুষতন্ত্র স্বেচ্ছায় নারীদের হাতে তুলে দেয় না। নারীদেরই সেটা আন্দোলন করে অর্জন করতে হয়। তাই 'উলট-পুরাণ'-এ দেখি তারা সবলে নিজেদের প্রাপ্য আদায় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ব্রিটেনের লোকসংখ্যার অনুপাতে রাষ্ট্রীয় পরিষৎ এ নারী সদস্যের দাবীতে নিখিল ব্রিটিশ নারী বাহিনি শোভাযাত্রা করে পার্লিয়ামেন্ট অভিযান করে। শুধু তাই নয়, প্রকাশ্য দিবালোকে পুরুষদের খামচিয়ে কামড়িয়ে জর্জরিতও করে। বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে নারীদের দাবি ও শোভাযাত্রার বর্ণনা অসাধারণ ব্যঙ্গের খোরাক হয়ে উঠেছে।

রাজনারায়ণ তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন ইংল্যান্ডে জ্ঞান ও ধর্মচর্চায় নিযুক্ত থাকা কিছু ইংরেজদের বঙ্গরাজ 'শ্বেতদ্বীপী ব্রাহ্মণ' উপাধি ও উপবীত দিয়েছেন। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী এর উদ্দেশ্য ধরে নেওয়া যায় যে উপাধি ইত্যাদি দাক্ষিণ্য বিতরণের মাধ্যমে কিছু প্রভাবশালী সরকারি বশংবদ তৈরি করা। ভারতের প্রকৃত ব্রাহ্মণদের ক্ষুণ্ন না করার কারণেই সম্ভবত এই শ্রেণির ব্রাহ্মণত্বের সৃষ্টি। পরশুরামের গল্পেও গবসন টোডিকে 'খাঁসাহেব' উপাধি দেওয়া হয়েছে। তিনি এই উপাধির উপযুক্ত হলেও ভারতমনা সংবাদপত্র সরকারকে সাবধান করে দিয়েছে যে এইসব উচ্চ উপাধি যেন ইউরোপীয়ানদের বেশি দিয়ে সস্তা না করা হয়, 'তাহা হইলে ভারতীয় রায়সাহেব খাঁবাহাদুর প্রভৃতি ক্ষুণ্ন হইবেন এবং তাহাতে ইউরোপের উন্নতি পিছাইয়া যাইবে।' সংবাদপত্র এও আশা করে যে খাঁসাহেব টোডি এরপর রাজদ্রোহী লিবার্টি লীগের ছায়া মাড়াবেন না। নতুন উপাধি সৃষ্টি করে নয়, বর্তমান উপাধি বিতরণের সঙ্গেও যে সমস্যা জড়িয়ে আছে, তা প্রকাশ করে পরশুরাম কৌতুকের স্বতন্ত্র দিকনির্দেশ করেছেন।

রাজনারায়ণের রূপক শেষ হয় হঠাৎই। কিন্তু রাজসূয় যজ্ঞ সম্পর্কে দুটি সংবাদপত্রের বিপরীত মন্তব্যকে উল্লেখ করে পরশুরাম অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে তাঁর গল্পকে শেষ করেছেন। আর ব্রিটিশ মেষবংশের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তৈরি করা কমিশনের প্রেসিডেন্টরূপে স্যার ট্রিক্সি টার্নকোটের কামরূপ যাত্রায় গল্পটিও বৃত্ত সম্পূর্ণ করে সমগ্রতা পেয়েছে।

পাঁচ.

পরিশেষে একটি বিষয় পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন– দুটি গল্পকে পাশাপাশি রেখে আলোচনা করার উদ্দেশ্য এই নয় যে পরবর্তী রচনাটি পূর্বসূরির কাছে কতটা ঋণী তা প্রমাণ করা বা স্বীকৃতিহীনভাবে পূর্ববর্তী রচনাকে নিজের গল্পে ব্যবহার করার ত্রুটিকে প্রকট করা। স্বীকৃতির প্রশ্নটাকে সরিয়ে রেখে আমরা ভাবতেই পারি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার অসংখ্য কপটাচার সম্পর্কে পরশুরাম বিচলিত ছিলেন এবং এর বিরুদ্ধে কলম ধরার ইচ্ছায় তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্র অনুযায়ী ব্যঙ্গ-রচনাকেই মাধ্যম হিসাবে বেছে নেন। মনে হয়, সবকিছু উলটো করে তাঁর মনে পড়ে যায় এবং সেখান থেকে কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা একেবারে ভিন্ন রীতিতে নিজের লেখায় ব্যবহার করেন। সবিশেষ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এ রকম উদাহরণ সাহিত্যে কম নেই। কিন্তু তার ফলে যে গল্পটি আমরা তাঁর কাছ থেকে পেলাম তার সঙ্গে প্রথম গল্পটির দূরত্ব যোজন যোজন। যদি এই একটি গল্পের জন্য বাঙলা ব্যঙ্গ সাহিত্যকে পরশুরামের কাছে ঋণী থাকতে হয়, তবে পরশুরামকেও ঋণী থাকতে হবে বিগতযুগের আর এক লেখকের কাছে। হয়তো প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবে T S Eliot-এর কয়েকটি পরিচিত লাইনও: "No poet, no artist of any art, has the complete meaning alone. His significance, his appreciation is the appreciation of his reletion to the dead poets and artists. You cannot value him alone; you must set him, for contrast and comparison, among the dead." সেই কারণে, অনন্বয়-অনুভাবের মাধ্যমে 'উলট-পুরাণ'-এর মত অসামান্য একটি গল্পের প্রাপ্তিকে স্বাগত জানিয়েও, পেছনে রাজনারায়ণের 'আশ্চর্য্য স্বপ্ন'-এর ভূমিকাকে, তা সে যত নগণ্যই হোক, উপেক্ষা করা যায় না। অনেক ছোট ছোট চিন্তাকে স্বীকরণ করেই একটি সার্থক সৃষ্টি সম্ভব, গঙ্গোত্রীর ফোঁটা ফোঁটা জল নিয়েই তো কূলপ্লাবী গঙ্গা।

দীপক গোস্বামী
ভারতের প্রাবন্ধিক

Coca-Cola
খোলো খুশির জোয়ার!
Coca-Cola

ছোটগল্প

বীজ

সুব্রত মণ্ডল

ভয় পবেন না, কিছক্ষণ পরই ঘোর কেটে যাবে। ও নিজেই ভুল বুঝতে পারবে। ডক্টর গাঙ্গুলি সবার দিকে চোখ বুলিয়ে নেন। তারপর বলেন– আপনাদের এখন অনেক দায়িত্ব, গীতাকে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হতে দিন। মনে হয় না কোনও সাইকিয়াট্রিস্টের সাহায্য নেবার দরকার আছে। সবার ভালবাসা ওকে মানসিক শক্তি যোগাবে।

ডাক্তারবাবুর দীর্ঘ বক্তৃতা সবার ওপর হাল্কা সম্মোহনের কাজ করে। সমীরণ মায়ের দিকে চায়– প্রৌঢ়া মহিলা, মাথার অধিকাংশ চুল পাকা, কেঁদে কেঁদে ফুলে গেছে।

বাবা শক্ত মানুষ। জীবনযুদ্ধের বহু জয়-পরাজয়ের সাক্ষী। রিটায়ার্ড সরকারি চাকুরে। জীবন এখন তার কাছে নিরীক্ষার বস্তু। ঠিক যেন জীববিদ্যা ক্লাশের কাচের জারে রাখা প্রাণিদেহ। তিনিও আজ বিচলিত।

ডক্টর গাঙ্গুলি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন। প্রেসার মাপার যন্ত্র আর স্টেথোস্কোপটা ব্যাগে ঢোকান। বাঁ-হাত দিয়ে অবিন্যস্ত চুলগুলো অন্যমনষ্কভাবে ঠিক করেন। তার চওড়া কাঁধ, আর প্রশস্ত কপাল একজন সফল প্রফেসনালকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সমীরণের কাঁধে হাত রেখে বলেন– মি. রায় আপনি স্বামী, আপনার দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। তারপর পিঠে হাল্কা চাপড় মেরে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

বিয়ের বছর তিনেক পর থেকেই চিন্তাটা গীতার মাথায় ঘুরতে থাকে। বিশষত সমীরণ যখন অফিসে থাকে। দুপুরের রোদ্দুর ঠিক বেলা দুটো নাগাদ কার্নিশে ভর করে ঘরে এসে হাজির হয়। তখন ওর ঝিমোবার সময়। কোথা থেকে একটা বড় মাছি ভোঁ ভোঁ করতে করতে কখনও কপালে, কখনও-বা ঠোঁটে এসে বসে। এতে অবশ্য ঝিমুনির

বাপির কোয়ার্টারে একটা মিনি চেম্বার আছে। সাধারণত ও বাড়িতে রোগী দেখে না। তবে মাঝে-মধ্যে বেনিয়ম হয়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আর কিছু জরুরি রোগীর প্রয়োজনে– ইচ্ছা না থাকলেও এ রকম একটা কাজ চালানো ব্যবস্থা করতে হয়েছে। সমীরণের ব্যাপারটা বাপি জানে। তার বেশ কিছু জানা রোগীর জানা সমস্যার শরিক সে।

মৌতাত বাড়ে বৈ কমে না। কিন্তু রোদ্দুরটা সরাসরি মুখে এসে পড়লে ভাত ঘুমটা ভেঙে যায়। তারপর এপাশ-ওপাশ। কোলবালিশ মাথায় আর মাথার বালিশ পায়ে। শেষে দুটো বালিশই মাটিতে পড়ে যায়। ভাবনাটা শিরীষের আঠার মত জুড়ে থাকে। প্রথম দিকে এসব কথা নিয়ে গীতা বড় একটা ভাবত না। তখন সমীরণ তার পিয়ানোর সব ক'টা চাবি নিয়ে খেলা করত। নিত্য-নতুন সুরের মায়াজালে এসব নিয়ে ভাববার অবকাশ ছিল না। কিন্তু এক সময় সব সুরই মুখস্থ হয়ে যায়। নতুন সুরের অভাবে পিয়ানোটা আর বাজাতে ইচ্ছা করে না। তারপর থেকেই ক্ষ্যাপাটে চিন্তাটা তাকে তাড়া করে বেড়ায়। এখন ওর নিঃসঙ্গতার সাথী জানলায় আটকানো আকাশ। নেমে আসা শূন্যতাকে ও দু'হাতে বন্দী করে। তারপর লুকোচুরি খেলায় ক্লান্ত হয়ে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে।

পাতাল রেলে রবীন্দ্রসদন স্টেশনে গীতা দাঁড়িয়েছিল। ট্রেন আসতে তখনও মিনিট পাঁচেক বাকি। দু'মিনিট কেটে গেল, দেয়ালে রবি ঠাকুরের কবিতা আর গান পড়ে। বাকি সময়টা ভেবেছিল টিভিতে কুং ফু দেখে কাটিয়ে দেবে। কিন্তু তার আগেই সুহাসিনীর ডাকে চমকে যায়। সুহাসিনী কলেজ-জীবনের বন্ধু। এক সময় বেশ অন্তরঙ্গতা ছিল। কলেজে পড়তে পড়তেই ওর বিয়ে হয়ে যায়। রঙ শ্যামলা কিন্তু মুখে আলগা চটক আছে। ওকে দেখে মনটা খুশিতে ভরে যায়। জড়িয়ে ধরে বলে– বাবা! কতদিন পরে! কোথায় ছিলি?

তুই কোথায় ছিলি? সুহাসিনী খুশি চেপে রাখতে পারে না।

আর যাব কোথায়? মেয়েরা যেখানে থাকে, শ্বশুরবাড়ি। সুহাসিনী গীতার আপাদমস্তক জরিপ করে বলে, তোর ফিগারটা কিন্তু একই রয়েছে। এখনও কলেজ স্টুডেন্ট মনে হয়।

গীতা মনে মনে খুশি হয়। অনেকটা কথা ঘোরাবার ভঙ্গিতেই বলে, তোর ছেলে মেয়ে?

দুটো। বড়টা মেয়ে, ছোটটা ছেলে। সুহাসিনীর মুখে আলগা তৃপ্তির হাসি। জিজ্ঞেস করে– তোর?

গীতা প্রশ্নটার জন্য প্রস্তুত ছিল না। আমতা আমতা করে বলে– এই...।

বুঝেছি, আর বলতে হবে না। এখন ইচ্ছা নেই তাই তো? তবে আর দেরি করিস না। তিরিশের মধ্যেই মেয়েদের মা হওয়া উচিত। অনেক সুবিধে আছে, পরে বুঝবি। সুহাসিনীর বোধহয় আরও কিছু বলার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ট্রেন এসে যাওয়ায় থামতে হয়।

গীতা ওকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই কামরায় উঠে পড়ে। বাইরের দিকে চায়। সুহাসিনী তখনও দাঁড়িয়ে। বোধহয় উল্টো দিকে যাবে। গাড়ি ছাড়ার পর মনে হল ঠিকানাটা জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

এরপর থেকেই ভাবনাটা যখন-তখন জুড়ে বসে, কোনরকম সাবধান না করেই।

রাতে সমীরণ শবাসন করে। খাওয়া-দাওয়ার পর নিথর নিশ্চুপভাবে মিনিটের পর মিনিট পড়ে থাকে। একদিন গীতা জিজ্ঞাসা করেছিল।

সমীরণ বলে, বহু দিনের অভ্যাস। ক্লান্তি দূর হয়, মনের গ্লানি চলে যায়। ঘুম আসতে দেরি হয় না।

গীতা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। খাটে সমীরণের জীবন্ত মৃতদেহ। বুকটা খুব হাল্কাভাবে ওঠানামা করে। গেঞ্জিটা বুক পর্যন্ত তোলা। পাজামার দড়ি আলগা, কোমরে মেয়েদের মত কালো দাগ। বোধহয় দড়ির। পশমের এক কুমারী পথ বুক পেট হয়ে অন্ধকার উপত্যাকার নেমে গেছে। মাঝে মধ্যে সাদার আঁচড় দেখতে পায়। ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতায় গলা শুকিয়ে আসে। মনে হয় মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র উচ্চারণ করে মৃত দেহে প্রাণ সঞ্চার করে। নিঃশ্বাস ঘন হয়। বহু দূর থেকে অজানা সুর ভেসে আসে। একদম নতুন। গীতা একটানে পাজামাটা নাবিয়ে দেয়।

এক সময় ঐকতান শেষে সে বাঁ-হাতটা চোখে মুড়ে অন্ধকারকে নাবিয়ে আনে। ক্লান্তির মোহজালে ধীরে ধীরে বন্দী হয়। আর কথা বলতে ইচ্ছা করে না। তবুও বহু কষ্টে ইঁদারায় ডুবুরী ডুবিয়ে ইচ্ছাটাকে তুলে আনে। বলে, শুনছ?

সমীরণের গলা থেকে ঘড় ঘড় আওয়াজ শুনতে পায়। সেটার মানে হাঁ কিংবা না দুটোই হতে পারে। গীতা বিরক্ত হয়। আবার বেশ একটু জোরে বলে, বলি শুনছ?

সমীরণ চোখ মেলে। মুখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

শোন, বলছি কিনা! তারপর ইতস্তত করে।

বল না! সমীরণ বিরক্ত হয়।

না ঠিক আছে।

গীতা আবার নিজেকে গুটিয়ে নেয়। মনে মনে ঠিক করে অন্য একদিন সময় সুযোগ বুঝে বলবে। সমীরণের দিকে চায়। সে আবার আসনরত, শবাসন।

ক'দিন পর গীতা বলে, চল একদিন বাপিদার বাড়ি ঘুরে আসি।

বাপি সমীরণের ছেলেবেলার বন্ধু। মেয়েদের ডাক্তার। চাকরি আর প্রাকটিস দুটোই করে। আগে প্রায়ই বাপিদের কোয়ার্টারে দু'জনে হাজির হত, কিছুটা দরকার, বাকিটা বন্ধুত্বের তাগিদে। গীতার দেহপটের ব্যাকরণ সমীকরণ ছাড়া বাপিই জানে, কিছুটা।

সমীরণ ভ্রু কুঁচকোয়, ইদানীং সে অজ্ঞাত কারণে বাপির কোয়ার্টারে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। বলে, হঠাৎ?

বাপিদাকে একবার দেখাব।

হঠাৎ?

আমার কোনও অসুখ আছে কিনা বলে দেবে।

তোমার আবার অসুখ কিসের? দিব্যি ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছ।

সে তুমি বুঝবে না।

কেন?

তোমার সে অনুভূতি নেই।

সমীরণ আহত হয়। মুখে বেদনার ছায়া নামে। তারপর বলে, ঠিক আছে আমার কোনও অনুভূতি নেই। তোমার কি সমস্যাটা তাই বল?

আমার বাচ্চা হচ্ছে না কেন জিজ্ঞাসা করব।

ও এই কথা। ব্যাপারটা সমীরণ খুব সহজভাবে নেয়। তারপর বলে, চল, সামনের রবিবার। বাপিতো বাড়িতেই থাকে।

বাপির কোয়ার্টারে একটা মিনি চেম্বার আছে। সাধারণত ও বাড়িতে রোগী দেখে না। তবে মাঝে-মধ্যে বেনিয়ম হয়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আর কিছু জরুরি রোগীর প্রয়োজনে– ইচ্ছা না থাকলেও এ রকম একটা কাজ চালানো ব্যবস্থা করতে হয়েছে। সমীরণের ব্যাপারটা বাপি জানে। তার বেশ কিছু জানা রোগীর জানা সমস্যার শরিক সে। এ নিয়ে নতুন কিছু ভাববার অবকাশ নেই। ওকে বলেও দিয়েছে। তবু বন্ধুত্বের খাতিরে গীতাকে দেখতে হয়। ইচ্ছা না থাকলেও। বিরক্তির স্পন্দন মুখে ঢেউ তোলে না। ঠাণ্ডা গলায় গীতাকে টেবিলে শুতে বলে। পেশার প্রথম দিকে বাপির কিছুটা অসুবিধে হত। বিশেষত পরীক্ষার এ সময়টুকুতে। এক পরিচিত অস্বস্তি চিরুনির দাঁড়ার মত দেহে ফুটত।

প্রথমদিকার রোগিণী, সেই বিখ্যাত অভিনেত্রীর কথা মনে পড়লে

আজও লজ্জা হয়, ডাক্তারবাবু আপনি ব্লাশ করেছেন।

না। এখন এসব অনুভূতি নেই। অভিজ্ঞতা আর পেশার দক্ষতা হাওয়ামহলের দরজাগুলোয় খিল তুলে দিয়েছে। হাতে রবারের দস্তানা তুলে নেয়। টেবিলে তিরশের আলপনা, লজ্জালু রঙে আঁকা। হৃদস্পন্দন স্বাভাবিক। রক্তচাপে উদ্বেগের কারণ নেই। মধ্যদেশে চর্বি বয়স অনুপাতে সঠিক। নৃবীজ সৃষ্টিকারী মাতগ্রন্থি সুস্পষ্ট। সংযোগকারী ডিম্ববাহী নলিকায় দোষের চিহ্ন নেই। শক্তিশালী স্নায়ুরজ্জু জরায়ুকে বেঁধে রেখেছে শেষপ্রান্তে। দেহের দ্বিপাক্ষিক ক্রন্দন ঘড়ির কাঁটার মত নিয়মিত। রক্ত শূন্যতা, অতিক্ষরণ, স্নায়বিক দুর্বলতার কোনও লক্ষণ নেই। বাপি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। আর পরীক্ষার দরকার আছে বলে মনে হয় না। মা হবার এক আদর্শ আধার, ঘোষণা করতে কোনও দ্বিধা নেই।

এ ফলাফল তার অজানা ছিল না। তবু বন্ধুত্বের খাতিরে এক মিথ্যা অভিনয়ের কুশিলব হতে বিবেকে লাগে। বহুবার সে সমীকরণকে জানিয়েছে, তার অভিমত। আজও জানাতে হবে।

ঘরের কোণে বেসিনে সাবান দিয়ে হাতটা ধুতে ধুতে বলে, একটা ট্যাবলেট দিচ্ছি একমাস খাবে। আর এই টেস্টটা কোনও ভাল জায়গা থেকে করিয়ে আমার কাছে আসবে।

গীতা উঠে বসে। চোখে ঘুমের রেশ। বলে, বাপিদা কি দেখলে?

বাপির গাম্ভীর্যে চিড় ধরে না। বক্তৃতার ঢংয়ে বলে, ইচ্ছা করলেই আমরা কাউকে আনতে পারি না। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এ রকম ভুরি ভুরি ঘটনা আছে।

আমি কি সেরকম ঘটনার মধ্যে পড়ি?

বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে এর উত্তর আমি এ মুহূর্তে দিতে পারি না। লেট মি ইনভেস্টিগেট দ্য কেস।

কবে জানতে পারব?

এক মাস, দু'মাস, এক বছর... আমার সঠিক উত্তর জানা নেই। গীতা টেবিল থেকে নেমে কি যেন ভাবে। তারপর টয়লেটের দিকে যেতে যেতে বলে, বাপিদা তোমার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখতে পাচ্ছি। আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই দরজা বন্ধ করে দেয়।

বাপি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। সমীরণের দিকে তাকায়। বহুদিনের বন্ধু। সেই স্কুলজীবনের। গোলগাল মধ্যতিরিশের সুদেহী যুবক। এক সময়ে ফুটবল টিমে ডিফেন্সের চৌকস খেলোয়াড়। অথচ এখন ওর বিধ্বস্ত চেহারা দেখে মনে হয় না– ও একজন অতীতের সীমানা রক্ষার কড়া প্রহরী। বাপি কণ্ঠস্বরে বন্ধুত্বের উষ্ণতা মুছে পেশাদারী শীতলতা আনার চেষ্টা করে। বলে, সমীরণ! এটা হারা গেম। আমি আগেও বলেছি, আবার ভবিষ্যতেও বলব, গীতা মা হবার আদর্শ আধার। তারপর দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে কি যেন চিন্তা করে বলে, প্যাথলজির রিপোর্ট অনুযায়ী বরং তোর স্পার্মে জীবনের সংখ্যা খুব কম। আমি তোর বন্ধু। আমি মনে করি এটা তোর বহু আগেই গীতাকে জানানো উচিত ছিল।

টয়লেটে ফ্লাশ টানার আওয়াজ হয়। বাপি গলা নামিয়ে বলে, ইটস্ অ্যা লস্ট কেস।

দরজা খুলে গীতা ঘরে ঢোকে। তারপর বাপিকে লক্ষ্য করে বলে, বাপিদা বাচ্চা আমার চাই-ই-চাই। মা আমি হবই। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বলে, কাগজে তো কত ঘটনাই দেখি। আমারই-বা হবে না কেন? মুচকি হেসে সমীরণের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে চায়।

সমীরণকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বাপি বলে– নিশ্চয়ই। আমরা বিজ্ঞানের ছাত্ররা সব সময় আশাবাদী। তোমার এ নিয়ে এত চিন্তার কারণ নেই।

ধর্মতলায় আয়কর ভবনের উল্টোদিকে একটা তেকোণা ট্রাফিক আইল্যান্ড আছে। ঠিক আলো অফিসের সামনে। গাছপালা আর নকল পাহাড় দিয়ে সাজানো। আলো অফিসের দিকটা প্রাইভেট গাড়ি রাখার জায়গা। আর একদিকে উত্তরমুখী বাসযাত্রীরা দাঁড়িয়ে থাকে। অন্যদিকটা মোটামুটি ফাঁকা থাকে। সন্ধ্যার পর জায়গাটা নিশি সহচারিণীদের দখলে চলে যায়। সেদিন লোডশেডিং ছিল। সমীরণ অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে ওই ফাঁকা জায়গাটার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে। দু'জন আদিবাসী ধরনের লোক– মাথায় সাতরঙা পাগড়ি– হাতে পোর্টেবল মাইক্রোফোন। কারবাইডের আলোর সামনে বহু বিচিত্র জিনিস। দুটো বেজি আর একটা বাঁদরের মাথা। অদ্ভুত দর্শন মৃত পাখির দেহ থরে থরে সাজানো। হরেক রকম শিকড়, জড়িবুটি আর লাল নীল শিশি বোতল। বহুদৃষ্ট এ দৃশ্যকে পাশে ফেলে সমীরণ এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সহকর্মী রতিকান্ত বাবুকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। রতিকান্তবাবু অফিসের রিক্রিয়েশন ক্লাবের ড্রামা সেক্রেটারি। বয়স বছর পঞ্চাশ, গায়ের রঙ ফর্সা, চুল কলপ করা, বেশ জামাই-জামাই চেহারার সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তি। উবু হয়ে বসে বাঁ-গালে হাত দিয়ে বাজীকরের বক্তৃতা শুনছেন। নিজের অজান্তে পা আটকে যায়। গুটি গুটি করে এগিয়ে রতিকান্তবাবুর পেছনে দাঁড়ায়।

বাজীকর অধ্যাপকের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। এক হাতে পাখির বিরাট পালক, আরেক হাতে প্লাস্টিক জ্যাকেটে মোড়া বই। বইয়ের এক এক পাতা খোলে আর আদরের ভঙ্গিতে পালক দিয়ে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার সঙ্গে থিয়েটারি ঢঙে বাংলা হিন্দি মিশিয়ে বক্তৃতা। কারবাইডের আলোয় বিদেশিনী বিবসনাদের ছবি প্রতি মুহূর্তকে ভিন্ন ভিন্ন ফ্রেমে বন্দি করে। রতিকান্তবাবু একটু এগিয়ে বসেন। সমীরণ এ ধরনের দৃশ্যে অভ্যস্ত নয়। তবু আলো-আঁধারির রহস্যজাল আর বক্তৃতার বিষয়বস্তু তাকে আটকে রাখে।

নমস্তে বাবুলোগ। হাম লোক আয়ে হ্যায় বিন্ধ পর্বতসে। কলকাত্তাকা ভালাই করনেকে লিয়ে। এ সমস্যা সারা দুনিয়া কা সমস্যা হ্যায়। লজ্জা কোরবেন না বাবুলোগ, হামলোক জানতে হ্যায়– আপলোক কা কেয়া জরুরত। ইয়ে শিশি দেখুন বাবুরা, ধনেশ পক্ষিকা তেল আছে। মালিশকে লিয়ে। একদম জিরো জিরো সেভেন। দশ রুপায়া শিশি। দো শিশি বিশ রুপায়া। অউর এক শিশি ফ্রি। তারপর দর্শকদের দিকে চোখ বুলিয়ে সঙ্গী বাজিকরকে কি যেন ফিস ফিস করে বলে। সঙ্গী বাজিকর তার ঝুলি থেকে কাচের গুলি সাইজের এক কালো বস্তু বার করে ওর হাতে দেয়।

দেখিয়ে বাবু এ অনুরাগকা গোলিয়া আছে। ইসকা অন্দরমে হ্যায়, শুয়ারকা বাল, ঘোড়ে কা ঘিলু আউর ষাড়কা আসলি চিজ, উসকা তেজ! দশ রুপায়া ডজন– এক মাসকা লিয়ে। একদম গ্যারেন্টেড মাল। জিসকা পিতা হোনে কা তখলিপ হ্যায় উসকে লিয়ে এ গোলিয়া অব্যর্থ। ইসকা রেজিস্টারি নাম্বার হ্যায় জিরে জিরো এইট।

সঙ্গী বাজিকর টেপ রেকর্ড চালিয়ে দেয়। হিন্দি গানের কলি ভেসে আসে– লেড়কার ওপর লেড়কি নাচে– ক্যায়সা হ্যায় দিবানা। উপস্থিত দর্শকদের মাঝে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। বাজিকর রহস্যময় হাসির ঢেউ তুলে ওষুধ বিলি করতে থাকে। রতিকান্তবাবু দু'শিশি তেল নেন। সমীরণ দূর থেকে নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়, অনুরাগ কা গোলিয়া।

রাতে গীতার ডাকে সে সম্বিত ফিরে পায়। আজ শবাসনে তার চিত্ত বিক্ষিপ্ত। ভ্রুর মাঝে আগুনের চিহ্ন নেই। একে একে বিদেশিনীরা এসে হাজির হয়। সে চোখ মেলে চায়। গীতা বলে, উঠে বোস, কথা আছে।

শুনতে পাচ্ছি।

তুমি কি কিছু চিন্তা করেছ?

কি ব্যাপারে?

আমার ব্যাপারে, আমি বাপিদার ওপর ভরসা রাখতে পারছি না। অনেকদিন তো হয়ে গেল। অষুধে তো কিছু কাজ হল না।

বাপি তো বলেইছে সময় লাগবে।

হ্যাঁ শেষ সময়! আমি একবার ডক্টর গাঙ্গুলিকে দেখাব।

ডক্টর গাঙ্গুলি বাপির মাস্টারমশাই। কিছুদিন আগে বাপিই একবার ওঁর পরামর্শ নিতে বলেছিল। সমীরণ রাজি হয়নি। বলেছিল, তোর ওপর আমার পুরো বিশ্বাস আছে। যদি কোনওদিন দরকার হয় অমিই বলব।

সে উঠে বসে। গীতার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চায়। ওকে ঠিক সুন্দরী বলা যায় না, কিন্তু আকর্ষণীয়া। মেদহীন ছিপ ছিপে চেহারায় পুরুষের চিত্তবিভ্রম নিশ্চিত। সে ভাগ্যবান, অন্তত গণ্ডির বাইরের লোকেরা তাই বলে। গীতাকে সে খুবই ভালবাসে। দরকার হলে যাত্রার নায়কের মত চিৎকার করে বলতে পারে– প্রিয়তমা, প্রাণসখী, গ্রহণ কর আমার হৃদ্‌কমল।

সে আজকাল বাঁকা হাসে। তার অভিমান, চাপা ক্রোধ বৃত্তাকারে ঘুরে বেড়ায়। বহিঃবৃত্তবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষায় সে শিকারী বিড়ালের মত ওৎ পেতে থাকে। তার আনন্দ, বেদনা, স্বচ্ছলতা, ব্যর্থতা– সব অনুভূতির তরঙ্গমালা জীবকোষের সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কন্দরে অল্লজারিত গাণিতিক মালায় গাঁথা নিয়মাবলীকে অভিসম্পাত দেয়

পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে। কেন এ জন্ম? কেন এ জীবন? যদি-বা জীবন তবে কেন এ বিস্তার? কেন অমৃতের সন্ধানে এ সমুদ্র মন্থন? সে স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে লোভী সমীরণের দিকে।

গীতা উদ্বেগের স্বরে বলে, আমি ডক্টর গাঙ্গুলির ওপিনিয়ন নেব। তিন বছর হয়ে গেল আর কতদিন অপেক্ষা করব?

সমীরণের কাছে কোনও উত্তর নেই। কোনও সমাধান নেই। শুধুমাত্র অভিনয়ের জটিল থেকে জটিলতর দৃশ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া। মাঝে মাঝে সে শেষ দৃশ্যের অভিনয় দেখতে পায়– শবাসনে। সব অনুভূতির এক সংগঠিত হত্যাকাণ্ড সবক'টি চরিত্র এ হত্যায় চুক্তিবদ্ধ। ছাড় নেই– ফাঁকি নেই।

কলকাতার দামী স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ড. অনিমেষ গাঙ্গুলি, এফ আর সি ওজির চেম্বার কচি কলাপাতা রঙের। রঙটায় কেমন অসুখ অসুখ গন্ধ আছে। খালি হাসপাতালের কথা মনে হয়। গীতা টেবিলে শুয়ে পড়ে। নার্স পোশাক ঠিক করে দেয়। পুরনো অভ্যাসে হাতটা চোখের ওপর চলে আসে। হাতের ফাঁক দিয়ে দেয়ালে লক্ষ্য করে জগৎখ্যাত এক গুরুর ছবি। পরনে আলখাল্লা, মুখে হাল্কা হাসি। অস্বস্তিতে বাঁ-পাশে মুখ ফিরিয়ে নেয়। নার্সের চোখে সে ভাবের কোন প্রকাশ দেখে না। নিশ্চিন্ত বোধ করে।

ডক্টর গাঙ্গুলি প্রেসক্রিপশন করতে করতে বল পেনটা দাঁতে কামড়ে ধরেন, ইনটারেস্টিং কেস। অ্যাবসলিউটলি নরমাল। কেন কনসিভ করছে না ইনভেস্টিগেট করতে হবে। প্যাথলজিটা আপনি সল্ট লেকের লেকভিউ ল্যাবরেটরিজ থেকে করিয়ে নেবেন। ওদের কম্পিউটার আছে। উইদিন ফাইভ মিনিটস এই ন'টা টেস্টের রেজাল্ট পেয়ে যাবেন। তাছাড়া সার্ভিস রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড।

ডক্টর গাঙ্গুলির সোনালি চশমাটা ঝুলে পড়েছিল। উনি মাথার ওপর তুলে নেন। গীতা বাধ্য ছাত্রীর মত শুনে যায়। অদ্ভুত একটা নেশা নেশা গন্ধ, কড়া তামাক, ঘাম আর দামী সেন্টের। এটা বোধ হয় বিলেত ফেরতদের চেম্বারেই পাওয়া যায়। নিজের আবিষ্কারে ও মনে মনে হেসে ওঠে।

প্যাসেজটা নর্মাল। তবে ওভারির বাঁ-দিকটায় একটু ব্লকেজ আছে। মাইনর অপারশন দরকার। না, চিন্তার কারণ নেই। অ্যানিস্থিজিআর দরকার নেই– তবে কোনও রিসক্ নেব না। ডক্টর সুপ্রকাশ সেনের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নেবেন। উনি সব কেসে আমায় অ্যাসিস্ট করেন। ডেটটা সিসটারের কাছে নিয়ে নিন। ডাক্তারবাবু সমীরণের মুখ দেখে বোধ হয় বাকিটা বুঝতে পেরেছিলেন। বললেন, খরচার একটা হিসেব সিসটার দিয়ে দেবে। তারপর আমিতো আছিই।

বাবা খুব প্রয়োজন না হলে বাক্যালাপ করেন না। বৃদ্ধ বয়সে ঠাকুর ঘরে দ্বিতীয় সংসার পেতেছেন। কথাবার্তায় অনাসক্তির সুর। ভাষা, ভাব এবং পরিস্থিতির ভারসাম্য রক্ষা করে উনি প্রতিটি শব্দ নির্বাচন করেন।

শোন তোমায় একটা কথা কিছুদিন ধরে বলব ভাবছি। বাবা গম্ভীর গলায় বলেন। সমীরণ ভ্রু কুঁচকোয়।

তুমি বিদ্বান, তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান দেওয়া বাতুলতা।

সমীরণের কপালে বিরক্তির তিনটি রেখা ফুটে ওঠে।

প্রজাপতি ব্রহ্মা এক হতে বহু হবার উদ্দেশ্যে বিভাজিত হয়েছেন।

সমীরণ রাগত স্বরে বলে, তাতে কি? এতো বহু পুরনো কথা।

কিছুই নয়। তোমার সৃষ্টি আমার আত্মপ্রেমে। বাবা উঠে দক্ষিণের জানালাটা খুলে দেন। এক ঝলক হিমেল হাওয়া ঘরের তিন দেওয়ালে ধাক্কা মারে।

জানি তুমি রাগ করছ। আমি তোমার জন্মদাতা। তোমার দুঃখ বুঝি। যা করার তাড়াতাড়ি কর। কারণ সময় মৃত্যুকামী।

লজ্জা আর শীতল রাগ দু'পা বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে। সারাজীবন ঘানি টানার পর ক্লান্ত বাবা এখন উপনিষদ আর গীতা রহস্য পড়েন। বয়সের সহজাত সুবিধায় যে কোন কঠিন পরিস্থিতিকে দার্শনিক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যার সুযোগ নিতে উনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না।

সমীরণের শক্ত মুখ দেখে উনি ইতস্তত করেন। তারপর বলেন, জানি, তুমি ভাবছ অনধিকার চর্চা করছি। ওঁর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে আসে।
কিন্তু কি করি বল? জিভ যে বাধা মানে না। মনে হয় যদি কিছু সাহায্য করতে পারি।

সমীরণ ভেবে পায় না। কি উত্তর দেবে। তার দৃষ্টির বেদনা বাবাকে স্পর্শ করে। তিনি বলেন, যা হবার তা হবেই, তুমি আমি তার কি করতে পারি। শুধু মনে রেখ সময় মৃত্যুকামী।

এই ক্ষয়িষ্ণু প্রজন্মের লোকগুলোকে নিয়ে যত গণ্ডগোল। এদের মনের বিস্তার আকাশের মতই সীমাহীন। অপ্রিয় সত্য, অবাঞ্ছিত বাক্যকে এরা বিনয়ের মোড়কে মুড়ে পরিবেশন করতে জানে না। এদের ওপর রাগ করা সোজা কিন্তু অস্বীকার করা শক্ত। এক অদ্ভুত পরিস্থিতি আর ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে এরা জাহাজ থেকে দেখা বাতিঘর।

অপারেশনের ব্যাপারটা নিয়ে সমীরণ ধাঁধায় পড়ে যায়। এটা বাপিকে জানানো দরকার। কিন্তু ডক্টর গাঙ্গুলির ব্যবস্থাপত্রের সঙ্গে বাপির মতামতের অমিল তাকে চিন্তিত করে। জিনিসটা চেপে যাওয়াই শ্রেয় মনে হয়। ব্যাপারটা জানালে বাপির অহংয়ে আঘাত লাগতে পারে। তাছাড়া ডিগ্রি, অভিজ্ঞতা আর সুনামের গড়পড়তা পাল্লাকে ডক্টর গাঙ্গুলির দিকে বেশি ভারী করে। মনে ক্ষীণ আশা জাগে। অঘটনতো ঘটে।

অফিসে রতিকান্তবাবু চেপে ধরেন– ভায়া খবরটা কি? তুমি ক'দিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ।

সমীরণ অবাক হওয়ার ভান করে। জিজ্ঞাসু চোখে চায়।

আমাদের অনুরাগ গো। অনুরাগের বড়ি। রতিকান্তবাবু রহস্যের ঢেউ তোলেন।

সমীরণের সামনে দুটো পথ খোলা আছে। প্রথম পথ এক ঘুষিতে রতিকান্তবাবুর সামনের পাটির দাঁত খুলে ফেলা আর দ্বিতীয় পথ এই লম্পটটার কাছে আত্মসমর্পণ করা। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দ্বিতীয় পথের কথা কানে কানে বলে দেয়।

চলুন দাদা এক কাপ চা খাওয়া যাক। রতিকান্তবাবুকে ধরে ক্যান্টিনে নিয়ে হাজির হয়। দু'কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে বলে, বলুন কি খবর?

আরে আমার খবরতো জিরো জিরো সেভেন। তোমার খবর কি বল? রতিকান্তবাবু জোরে হেসে ওঠেন। হাসির গমকে বাঁধান দাঁত বেরিয়ে আসে। উনি বাঁ-হাত দিয়ে অদ্ভুত কায়দায় সামলে নেন।

সমীরণ অনুভব করে মানুষ কেন খুনী হয়। ঠাণ্ডা গলায় বলে– আপনি কি ব্যাপারটা কাউকে বলেছেন?

আরে এটা কি বলার ব্যাপার। নাকি লুকোনোর ব্যাপার। এত ঘর ঘর কা কাহানি। অমন কড়া সরকার সাহেব, ছ'ফুট ছয়, টকটকে রঙ, তার কিনা লবডঙ্কা।

রতিকান্তবাবু খিক খিক করে হাসতে হাসতে বলেন, তাকেও এ শর্মার কাছে আসতে হল। নিয়ে গেলাম বাঁকাবাবার কাছে। বছর না ঘুরতে ঘুরতেই বাচ্চা। বাচ্চা নয়তো লাল আপেল। এখন দার্জিলিং কনভেন্টে পড়ে।

রতিকান্তবাবুর গলায় দৃঢ়তা সমীরণকে অবাক করে। মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়– বাঁকাবাবা?

সে কিহে? বাঁকাবাবার নাম শোননি? গাইয়ে বাজিয়ে হিরোইন কে নয়? সবাইকে বাবা শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়েছেন। বাবার আশীর্বাদে মুখ্যু পণ্ডিত হয়, বাঁজা মেয়েছেলে দশ বেটার মা হয়। ছোটবেলায় ট্রামের ধাক্কায় বাবার কোমর ভেঙে যায়। তারপর থেকে ওঁকে সবাই বাঁকাবাবা বলে। ভাবছি তোমাকে বাবার কাছে নিয়ে যাব।

আধিদৈবিক, আধিভৌতিক বা পরাবিদ্যার ওপর সমীরণের কোনও দিনই বিশ্বাস ছিল না, এখনও নেই। সে অনুরাগ বটিকা কিনেছিল অনেকটা আবেগবশে, এক বাজিকরের ভোজবাজিতে মুগ্ধ হয়ে। বাঁকাবাবার ছবি সে কাগজে দেখেছে, নামের পাশে (লন্ডন) লেখা।

বলি ভাবছটা কি? রতিকান্তবাবু বাঘাটে গলায় জিজ্ঞাসা করেন। বলেন, আমি সব বুঝে গেছি। তোমার রোগ অষুধে সারার নয়। বাবা ছাড়া ভূ-ভারতে কেউ নেই এ রোগ সারায়। চল সামনের শনিবার ফলহারিণী কালী পুজো। শুভদিন! ছুটির পর তোমায় নিয়ে যাই। ভারি তো দু-ঘণ্টার পথ।

বাঁকাবাবার চোখে অসীমের আহ্বান। মৃদু হাসিতে সব প্রাপ্তির পরিতৃপ্তি। গলার আওয়াজ ভরাট। সাদা-কালোয় মেশানো দাড়ি জায়গায় জায়গায় গতি হারিয়ে জট পাকিয়ে তুলেছে। উত্তর-তিরিশের এক মহিলা জগৎসংসার ভুলে বাবাকে হাওয়া করে যাচ্ছেন।

বাবা কি যেন ইশারা করেন। স্যান্ডো গেঞ্জি পরা স্বাস্থ্যবান এক যুবক রুপোর পিকদানি বাবার মুখের সামনে তুলে ধরে। বাবা পিক ফেলেন। জর্দার সুগন্ধে চারিদিক ম ম করে ওঠে। ঋষভ কণ্ঠে বাবা ডাকে– রতি।

রতিকান্তবাবু প্রায় হুমড়ি খেয়ে ওঁর পায়ের তলায় চলে আসেন। রতিকান্তবাবুর অবাক চোখের সামনে দুটি আঙুল আকাশের দিকে তুলে ধরেন। সমীরণ বাবার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। বাবার চোখে বরাভয় চিহ্ন।

মহিলাটি বলে ওঠেন– বুঝতে পারছেন না? দুটো আঙুল, মানে ভি। ভি ফর ভিকট্রি। আপনার বন্ধুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

বাবা সঙ্গে সঙ্গে মাটির দিকে কি যেন ইশারা করেন। মহিলাটি বলেন– আবার উল্টোও হতে পারে।

বাবা আবার আকাশের দিকে আঙুলি নির্দেশ করেন। মহিলাটি ফিস ফিস করে বলে ওঠেন, সবই তিনি অর্থাৎ সবই ঈশ্বরে ইচ্ছা।

বাবার অট্টহাসিতে ঘর সচকিত হয়ে ওঠে। বুকের ওপর হাত রেখে উনি চোখ বোজেন। ধূপ-ধুনোর গন্ধ আর বাবার চরমতত্ত্বের সহজ ব্যাখ্যায় সমীরণের বিচার-বুদ্ধি গুলিয়ে যায়। সে অসহায়ের মত মহিলাটির দিকে চায়।

তিনি বলেন, বড় পুণ্যদিনে আপনি এসেছেন। আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, নির্ভয়ে বাড়ি যান।

গীতা প্রায় জোর করেই অপারেশনটা করিয়ে নিল। ডক্টর গাঙ্গুলির ভাষায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাকসেসফুল। একদম কসমিক সার্জারি– একটা মাস সাবধান, তারপর স্বাভাবিক।

গীতা কথাটা কিভাবে পাড়বে ভেবে পায় না। সে সমীরণের শবদেহের দিহে চেয়ে থাকে। মেয়েদের সহজাত লজ্জা তাকে বাধা দেয়। কিন্তু আনন্দ সংবাদের ভাগ স্বামীকে না দিতে পারার অপরাধবোধ তাকে ঘিরে ধরে।

স্বামীর বুকে আলগা আঁচড় কাটতে থাকে। সমীরণ আধবোজা চোখে তাকায়। গীতা পরম স্নেহে ওর বুকে মাথা রোখে। এক আজানা পুরুষের পদধ্বনি শুনতে পায়। এগিয়ে আসছে। গীতা ধড়পড় করে উঠে বসে। সমীরণ বিরক্ত হয়ে বলে, রাতের বেলা কি আরম্ভ করলে?

শোন শোন না, কথা আছে। আদুরে গলায় বলে।

সমীরণ পুরোপুরি চোখ মেলে চায়।

দুটো পিরিয়ড মিস করেছি।

সারা দেহের স্নায়ুগুলো টান টান হয়ে ওঠে। গলা থেকে অচেনা আওয়াজ শুনতে পায়– মানে?

গীতা হেসে ওঠে, বাচ্চা ছেলের মত কথা বোল না। মনে হচ্ছে আমার কিছু একটা হয়েছে। তারপর সব সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে বলে, মনে হয় বাচ্চা এসেছে। নড়াচড়া বুঝতে পারি। তলপেটটা কেমন ভারী ভারী।

সমীরণের ঘোর কাটে না। বুঝতে পারে না– এটা কি করে হল। অনুরাগ বটিকা? বাঁকাবাবা? অসম্ভব! তৃতীয় শ্রেণীর হিন্দি ছবি! নিষ্কর্মা দুপুরে হঠাৎ টিকেট কেটে ঢুকে পড়া। তবে অন্য কিছু? না তাও নয়। গীতাকে সে নিজের চেয়ে বেশি বিশ্বাস করে। ওর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করতে নিজেকেই অপরাধী মনে হয়।

বাপি চিৎকার করে ওঠে, অসম্ভব। তুই একটা ক্রিমিনাল। তোকে জেলে পোরা উচিত। তোকে বলেছিলাম গীতাকে সবকিছু খুলে বল, তা না করে তুই বাঁকাবাবা আর শুয়োরের লোম খাচ্ছিস। একটা নিরীহ মেয়ের ওপর কাটা-ছেঁড়া করলি। ছিঃ ছিঃ সমীরণ।

সমীরণ ক্ষীণ স্বরে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে। তবুওতো গীতার বাচ্চা আসছে।

তাতে কি প্রমাণ হয় তোর মত একটা শুকনো গাছে পাতা গজাতে আরম্ভ করেছে।

সমীরণ মিইয়ে যায়। বাপির দিকে সরাসরি না তাকিয়ে বলে, কি করতে বলিস?

স্যারের কাছে যা, ব্যাপারটা কনফার্ম কর।

তারপর?

পরের ব্যাপারটা নির্ভর করছে রেজাল্টের ওপর। স্যার যা বলেন তাই করিস। আর আমাকে কি হল জানাস।

গীতা ডক্টর গাঙ্গুলির টেবিলে শুয়ে জগদ্‌গুরুর দিকে তাকিয়ে থাকে। আজ আর জগৎকে মায়াময় মন হয় না। ছবিতে সে মরা শালিকের চাউনি দেখে। ঘরে বিলেত ফেরত গন্ধ নেই, বদলে অ্যামোনিয়ার ঝাঁঝাল গন্ধ ভেসে আসে। ভুরু কুঁচকে সিস্টারের দিকে চায়। সিস্টার অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে লাগোয়া টয়লেটের দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

ডক্টর গাঙ্গুলি পরীক্ষা শেষে বেসিনের দিকে যেতে যেতে প্রশ্ন করেন– কটা পিরিয়ড মিস করেছেন।

দুটো।

শরীরের কিছু পরিবর্তন বোধ করেন।

তলপেটটা ভারী ভারী লাগে। কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। বমি বমি ভাব।

সমীরণ জিজ্ঞাসু চোখে ডক্টর গাঙ্গুলির দিকে চেয়ে থাকে। উনি প্রেসকিপশন লিখতে লিখতে বলেন, ইউরিনটা টেস্ট করিয়ে নিন। আমি প্যাথলজি না করে কোন ভারডিকট দেব না।

রাতের বেলা আলাদিনের দৈত্য এসে শহরের এক একটা আরো নেভাতে শুরু করল। সমীরণ ঠিক যেন বন্দরগামী জাহাজে বসে সে অদ্ভুত দৃশ্য অসহায়ভাবে দেখতে লাগল। তারপর পাগলের মত আশ্চর্য প্রদীপটাকে খুঁজতে লাগল।

ইউরিন টেস্টের রেজাল্ট নেগেটিভ এল। তার অনাগত পিতৃত্বকে বিদ্রুপ করে গীতার ক্ষীণ রক্তপাত আরম্ভ হল।

সমীরণের মা আধুনিকতার বিচারে স্বল্প শিক্ষিতা, অর্থাৎ গ্রাজুয়েট নন। তিনি গ্রাম্য মহিলার মত দু'পা ছড়িয়ে, আমার একি হল রে, বলে কান্না আরম্ভ করলেন।

দিশাহারা সমীরণ প্রথম ফোন করল বাপিকে।

কিট– কিট– কিট–।

ডক্টর সরকার স্পিকিং। বাপির ঘুমন্ত গলা পাওয়া যায়।

আমি সমীরণ, ভীষণ বিপদ। গীতার রক্ত পড়ছে, বাচ্চাটা বোধহয় নষ্ট হয়েছে।

বাচ্চা? বাপির যেন আলগা হাসির আওয়াজ পাওয়া যায়।

তুই স্যারকে বাড়িতে কল দে। আমি ফোন করে বলে দিচ্ছি। ওনাকে নিয়ে আয়। গুড নাইট। সমীরণকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বাপি ফোনটা রেখে দেয়।

পরীক্ষা শেষে ডক্টর গাঙ্গুলি একটা ইনজেকশন দেন।

এখন ও ঘুমোবে। ওকে ঘুমোতে দিন।

তারপর রোমান সেনেটারদের মত বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলেন– না। এটা অ্যাবরশন নয়। কারণ কনসিভই করেনি। তীব্র মা হবার ইচ্ছায় গর্ভের এ সব লক্ষণ ফুটে উঠতে পারে। বিশেষত একটু বেশি বয়সে। এর একটা শক্ত ডাক্তারী নামও আছে। এ সময় রোগী আবসলিউটলি প্রেগন্যান্টের মত আচরণ করে। ঘুম ভাঙলেই ও সব বুঝতে পারবে। পরের দায়িত্ব আপনাদের।

সমীরণকে লক্ষ্য করে বলেন, অ্যায় অ্যাম সরি মিস্টার রয়।

অ্যায় ফিল ফর ইউ। তারপর গলা নামিয়ে মার্গ সঙ্গীতের আলাপের সুরে বলেন, আপনার একটা প্যাথলজি করা দরকার। চেম্বারে দেখা করবেন।

সমীরণ তুমি এক বোকা ষণ্ড! তাই তুমি সৃষ্টি তত্ত্বের কিছু জান না। আর দেরি করা যায় না। এটা তোমার জানা দরকার, কারণ সময় মৃত্যুকামী। চল আগে এক কাপ কফি খাওয়া যাক। খেতে খেতে জামিয়ে মাস্টারি করা যাবে। গ্যাসের নবটা অন কর। জানালাগুলো বন্ধ করে দাও। বাবা বলতেন আমাদের ব্যাভিচারী ঠাকদ্দারা নাকি লিখে গেছেন– আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, অগ্নির গুণ রূপ ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর ব্রহ্মার সত্ত্বগুণ সৃজনে সৃষ্টি এ মহাবিশ্বের... । বুঝতে পেরেছি তোমার ক্লান্তি শেষ সীমায়। আর সময় নেব না। সময় হয়ে গেছে। দেশলাইটা জ্বাল। এস, সৃষ্টি তত্ত্বকে প্রত্যক্ষ করি।

সুব্রত মণ্ডল
ভারতের কবি, ছোটগল্পকার

BE 100% SURE

Dettol

BPMPA

Proud Partner of icddr,b

ডেটল সাবান সুরক্ষা দেয় ১০০ রোগবাহী জীবাণু পর্যন্ত#

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত যে নতুন ডেটল সাবান আপনার পরিবারকে ১০০টি পর্যন্ত রোগবাহী জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয়। এজন্যই ডাক্তাররা সবসময় পরামর্শ দিয়ে আসছেন ডেটল ব্যবহার করার জন্য।

নতুন

সুরক্ষা দেয়

১০০

রোগবাহী জীবাণু পর্যন্ত#

This is supported by Microbiological assessments versus bacteria and fungi at an external GLP facility (Bioscience Laboratories, Bozeman, Montana, USA)

** Dettol Original Soap is a Grade-1 soap

DettolBD

ভ্রমণ

চিলিকা হ্রদের দেশে

দীপিকা ঘোষ

এক. গন্তব্য সিনসিনাটি থেকে ভূবনেশ্বর...

আগস্ট বিগত হলেও দিনের আলোয় তাপমাত্রা এখনো অনেকটা বেশি। সন্ধ্যার শান্ত রূপেও শীতলতার পরশ নেই। পৃথিবীর জলবায়ু উষ্ণতর হতে হতে ক্রমাগতই বদলে দিচ্ছে প্রকৃতিজগতসহ বিভিন্ন জীবকুলের সুপরিচিত সব অভ্যাস। কেন না মানবদেহের মত পৃথিবীর প্রত্যেক ইকোসিস্টেমে যেমন, তেমনি বন্য প্রাণীদের জীবনপ্রবাহেও রয়ে গেছে অন্তর্লীন সময়-পরিক্রমার একটি চেতনময় ঘড়ি, যা মানবশরীরের ইন্দ্রিয় নির্ধারিত কার্যপরিক্রমার মতই এক সর্বব্যাপ্ত সত্তা হয়ে কর্মরত নিঃশব্দে। ধরণীর বিচিত্র নিয়মনিষ্ঠার সঠিক প্রক্রিয়াগুলো সঠিক সময়ে, সঠিকভাবে এরই নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছে বলে জানিয়ে দিয়েছে বিজ্ঞান। পরিবেশবিদরা বারংবার তাই সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে মানুষের সব দানবীয় কার্যাবলীর বিরুদ্ধেই কয়েক যুগ ধরে চেঁচিয়ে চলেছেন। তাঁদের বক্তব্য– মানবসৃষ্ট অনাচারে বিশ্বের ইকোসিস্টেমে যে ব্যত্যয় ঘটে চলেছে নিরন্তর, তার পরিণতি মোটে শুভ নয় আমাদের জীবধাত্রী ধরিত্রীর জন্য! কারণ এ বিশ্ব এমনই এক সুপরিকল্পিত পরিকাঠামো, যেখানে প্রকৃতিজগতের সঙ্গে পৃথিবীর সবরকম জীবের সম্পর্কসূত্র বাঁধা! অতএব এবার সকলেরই সতর্ক হবার পালা!

দীপিকা ঘোষ

কথাসাহিত্যিক ও কলাম লেখক দীপিকা ঘোষের জন্মস্থান ফরিদপুর, বাংলাদেশ। বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী। ছেলেবেলা থেকে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত। কবিতা দিয়ে লেখা শুরু। সমাজের বিচিত্র চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরবর্তীকালে কথাসাহিত্যে প্রবেশ। ঔপন্যাসিক, ছোট গল্পকার এবং প্রাবন্ধিক। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা একুশ।

ঢাকা, কলকাতা এবং উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও সংবাদপত্রে ছোটগল্প, উপন্যাস এবং প্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

কিন্তু কারা হবেন সতর্ক? প্রকৃতির হৃদয়ে সব অনাচারের বিরুদ্ধেই প্রবল প্রতিবাদ নীরব রোষে মুখরিত। ভাদ্রের বিদায়লগ্ন সমাগত হয়েছে প্রায়, কিন্তু উত্তর আমেরিকার কোন প্রান্তে হেমন্তের দৃশ্যমান পদচারণা উৎসাহিত উল্লাসে এখনো দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। বসন্তের স্পর্শ পেয়ে যে অরণ্যকুল সবুজের লাবণ্যসুধায় রূপমুগ্ধদের ভুলিয়েছিল কয়েক মাস আগে, তাদের কেউই সময়ের নিয়ম মেনে বিদায় বেলার ব্যথার রঙে রেঙে ওঠেনি এখনো। এমনকি খুব শিগগিরই তার সম্ভাবনাও যে নেই তারও আভাস সুপরিস্ফুট ক্রমশ প্রকৃতির রাজ্য জুড়ে। বিশ্বের সভ্য দেশের নেতারা অবশ্য

এসব ব্যত্যয়ের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের ঝলমলে দীপ্ত শপথ ঘোষণা করে চলেছেন স্লোগানমুখর শক্তিমান উচ্চারণে। কিন্তু মানব সৃষ্ট অনাচারের কোন রকমফের আজও লক্ষ্যযোগ্য নয় তাতে।

এয়ারপোর্টের অভ্যন্তরে এয়ার কন্ডিশনার সক্রিয় সারাক্ষণ। অপাপবিদ্ধ চিরবসন্তের মোহনীয় ছোঁয়া শিরশরানি অনুভূতিতে ছড়িয়ে যাচ্ছে আপাদমস্তকে। বিস্তীর্ণ বিমানবন্দরের সর্বত্র ভাদ্রের উষ্ণতার বদলে সেজন্যই ছড়িয়ে রয়েছে রেশমিকোমল শীত-শীতভাবের আধখানা অলস ছোঁয়া। শীতকাতুরে যাত্রীদের অনেকে এরই মধ্যে হালকা গরম পোশাক জড়িয়ে রেখেছেন শরীর ঘিরে। আমার স্বামীও সচেতনভাবে পরে নিয়েছে একখানা কম ওজনের বসন্তে ব্যবহৃত লাইট জ্যাকেট। ছেলেবেলা থেকেই আমার অবশ্য শীতের সঙ্গে সখ্য যেমন, গ্রীষ্মের ব্যাপারে তেমনই অসহিষ্ণুতা। পাশে চোখ পড়তে নজরে এল, চার-পাঁচ হাত দূরেই চেয়ারে বসে দু'জন ভারী চেহারার মাঝবয়েসী রমণী গভীর সখ্যে এরই মধ্যে সংসারের গূঢ় গল্পে মেতেছেন গাঢ় মেজাজে। নারী চরিত্রের বিবিধ আঁটঘাঁটের গলিঘিঞ্জি যারা গুলে খেয়েছেন, তাদের অনেকেই অর্থবহ নিগূঢ় মন্তব্যে পরিচ্ছন্ন করে জানিয়ে দিয়েছেন– জগতে স্ত্রীজাতির আলাপন বিষয়ের অভাব কখনো ঘটে না। কী করেই বা ঘটবে? তাদের আলাপচারিতার বিষয়বস্তু তো আর পুরুষের আলোচনার মত সীমিত বিষয়ে সীমাবদ্ধ নয়। কান পাততেই বাক্যালাপের টুকরো কথা কানে এল– আমার স্টুপিড ছেলেটা যে মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করতে চলেছে, তাকে মোটেই আমার পছন্দ নয় বারবারা! মেয়েটির আচার-আচরণ তো নয়ই, আউটলুকও নয়! কিন্তু তাদের পছন্দের ওপর তো আর আমাদের কথা বলা চলবে না এ্যানা। এই তো দেখ না, আমার ছেলেকেও বিয়ের আগে আমি আর মাইক বারবার করে বারণ করেছিলাম, তাকে বিয়ে না করতে! গত বছরই সেপ্টেম্বরে তাদের বিয়ে হল, মাস দুই পরেই আলাদা হয়ে গেল দু'জনে! বারবারা জবাব দিলেন সখেদে। শাশুড়ী-পুত্রবধূদের সম্পর্ক সম্বন্ধে সেকালের মত একালেও বলা চলে, একশোভাগ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হলেও এই সম্পর্ক সাপে-নেউলের। বিশেষেত এ দেশের ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজে শ্বশ্রূমাতা আর পুত্রবধূরা কখনোই একই ছাদের তলায় বসবাস করতে উৎসাহী নন। কারণ উৎসাহী হলে সিংহভাগ ক্ষেত্রেই কুরুক্ষেত্র রচিত হবে। স্টুপিড ছেলের বুদ্ধিমতী জননী এ্যানা এবার উত্তরে জানালেন– ভালবাসার টানে পড়ে আমি অবশ্য মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি। তবে আমি অন্তর দিয়েই প্রার্থনা করে চলেছি, বিয়ের পরে শিগগিরই যেন বিচ্ছেদ ঘটে ওদের! তা নইলে দজ্জাল মেয়েটা ছেলেটোকে মোটে ভিড়তে দেবে না আমার কাছে!

আমাদের পাশের ফাঁকা দুটি চেয়ারে এরই মধ্যে মিলিটারিচেহারার দুজন তরুণ এসে বসে পড়েছেন দু'খানা কমপ্যাক্ট ল্যাপটপ বাক্স বলিষ্ঠ হাতে ঝুলিয়ে। একটু পরেই গভীর মনোযোগে দু'জনেই ডুবে গেলেন নিজের কাজে। পাশেই ধূমায়িত কফি থেকে ধোঁয়া উড়ে চলেছে ভাঙাভাঙা কুণ্ডলি পাকিয়ে। ব্রেকফাস্ট হিসেবে কফির সঙ্গে এয়ারপোর্টের খাবার দোকান থেকে ওরা কিনে এনেছেন নরম সুস্বাদু সুবাসিত কয়েকটি ডোনাট। সেগুলোর শরীর বেয়ে বিগলিত মাখনের শুষ্ক পেলবতা গড়িয়ে থাকায় শিশিরসিক্ত স্নিগ্ধতেজা ফুলের মতই দেখাচ্ছে তাদের। তরুণরা সম্ভবত এয়ার ফোর্সের অফিসার্স প্রশিক্ষণ নিতে চলেছেন নিজ দেশেরই প্রতিষ্ঠানে। পরিহিত পরিচ্ছদের সুপরিচিত বৈশিষ্ট্য থেকে অন্তত সে রকম ধারণাই তৈরি হচ্ছে যাত্রীদের মনে।

ঘড়িতে ভোর পাঁচটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট। আমরা সব প্লেনযাত্রীরা বসে আছি নর্দ্যান কেন্টাকি সিনসিনাটি এয়ারপোর্টের গেট নম্বর বি-আটের এক নম্বর টার্মিনালে। আমেরিকান এয়ারলাইনস ৪৩৮১ ফ্লাইট এখান থেকেই উড়াল দেবে শিকাগো শহরের ওহারে বিমানবন্দরের উদ্দেশে। এরপর ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস জার্মানির আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ফ্রাঙ্কফুর্ট হয়ে আমাদের পৌঁছে দেবে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে। সেখান থেকে ডোমেস্টিক ফ্লাইটবাহিত হয়ে ভুবনেশ্বরের বিজু পাটনায়েক ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে পৌঁছলে দেড় সপ্তাহের মত বিমান আরোহণ আর অবতরণের পালা সাঙ্গ হবে আমাদের। তখন সাগর পরিবেষ্টিত বিস্তীর্ণ উড়িষ্যার বিভিন্ন ট্যুরিস্ট স্পট পরিদর্শন করাই হবে একমাত্র কাজ। যে তালিকায় রয়েছে চিলিকা হ্রদ, কোনার্ক সূর্যমন্দির, পুরীর জগন্নাথ ধাম, নাম না জানা কুটিরশিল্পীদের ছোট ছোট অখ্যাত গ্রাম, বিভিন্ন বুডিস্ট সাইট, আদিবাসী অধ্যুষিত নিরালা প্রকৃতি , উড়িষ্যার প্রাচীন দুর্গ এবং সুবিখ্যাত চাঁদনিপুরের গোল্ডেন বিচ। মহাকালের বিবর্তনধারা যেখানে প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে প্রাচীন, মধ্য আর ঔপনিবেশিক যুগ পেরিয়ে অদ্যাবধি জমিয়ে তুলেছে শত সহস্র কাহিনিস্রোতের সব দুর্দান্ত রোমান্টিক রোমান্স। গড়ে তুলেছে বিচিত্র পুরাকীর্তি এবং সে-সব প্রতিষ্ঠানের রহস্যময় আকর্ষণীয় ইতিহাস।

হঠাৎ সকলের পিলে চমকে সশস্ত্র চেহারায় বিমানবন্দরের দু'জন সিকিউরিটি পুলিশ অফিসার কালান্তক যমের মত সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। এখানে যারা প্রবেশাধিকার পেয়েছেন, তাদের প্রত্যেককেই তুলোধুনো হয়ে সিকিউরিটির চেকিং সমাপ্ত করেই আসতে হয়েছে গেট নম্বর বি-আট এবং তার পাশের গেট, নয় নম্বর বোর্ডিং লাউঞ্জে। তাহলে অকস্মাৎ এই রহস্যময় আগমনের হেতু কি তাঁদের? আবারও কি কোন প্লেন হাইজ্যাক করার পরিকল্পনা কোথাও ধরা পড়েছে? নাকি এখানকার ঠিক অভ্যন্তরেই আক্রমণের নিশানা পেয়ে ছুটে এসেছেন দুই অফিসারর? তাঁদের আসার হেতু অবশ্য একটু পরেই পরিষ্কার হল। ডানপাশের গেট বি-নয়ের একেবারে কোণের দিকে পড়ে থাকা একটি পরিত্যক্ত হ্যান্ডব্যাগের উপস্থিতিই যে বিমান সিকিউরিটি পুলিশের আগমনের কারণ সেটা বিনা বাক্যেই জানিয়ে দিলেন অফিসারদের একজন। প্রথমে সাহসী হয়েও অশেষ সতর্কতায় ব্যাগটির ওজন অনুমান করলেন ভদ্রলোক। তারপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ

করে যথাস্থানে নামিয়ে রেখে যাত্রীদের উদ্দেশে সুগম্ভীর প্রশ্ন ছুঁড়ে জানতে চাইলেন– এটা কার? দিস হ্যান্ড ব্যাগ বিলঙস্ টু হুম?

উপস্থিত যাত্রীদের সবাই নিরুত্তর। চোখেমুখে আতঙ্কের পরিপুষ্ট আভাস। সত্যিই তো, সাতসকালে যাত্রীদের মাঝখানে কোন্ সন্ত্রাসী মুখোশ এঁটে বসে আছে কে বলতে পারে? সময় পেরুচ্ছে। অফিসার অপেক্ষমাণ উত্তরের প্রতীক্ষায়। কিন্তু কে দেবে উত্তর? বাইরে নিয়নবাতির প্রখর আলোকমালা। অরুণোদয়ের আভাস পেয়ে জগৎ থেকে সব অন্ধকার এখনো অপসারিত হয়নি। ঘড়িতে সকাল পাঁচটা বেজে পঁয়তাল্লিশ। সহসা দক্ষিণ এশীয় চেহারার বয়সে নিতান্ত তরুণ এক যাত্রী নিদারুণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্লথভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়েছে প্রশ্নের জবাব দিতে। যার মুখে উপস্থিত জনতার ভয়ার্ত ক্ষুব্ধ দৃষ্টি মুহূর্তেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে সৈকতভূমিতে আছড়ে পড়া উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ হয়ে। তাদের অনভিজ্ঞ অভিযোগ সম্ভবত নিঃশব্দে একটাই প্রশ্ন তুলছে এখন– এই ছেলে কি সন্ত্রাসীদের চর? নাকি নিজেই সরাসরি যুক্ত এর সঙ্গে? কিন্তু না, জনতার ক্ষুব্ধতা নিঃশব্দেই ঝিমিয়ে গেল বুকের অন্তরালে। পশ্চিমের বিরুদ্ধে অভিযোগের নানা খতিয়ান থাকা কিছু অস্বাভাবিক নয়। তবে ভদ্রতা এবং বাস্তবতা মেনে চলার সহবত শিক্ষা এদের সিংহভাগেরই যে রয়েছে এমন সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। নিজেদের ছায়া অতিক্রম করে সব বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশের আগ্রহকে ক্রিটিক্যাল মুহূর্তেও এরা সংযত করতে জানেন। অফিসার এবার জানতে চাইলেন– তোমার নিজের জিনিস এভাবে দূরে ফেলে রেখেছিলে কেন? কী উদ্দেশ্যে?

ছেলেটির চশমা পরা চোখের আড়ালে এই জিজ্ঞাসায় কী ভাবের উদয় ঘটল দৃষ্টিগোচর অবশ্যই হল না। তবে নিতান্তই কোণের দিকে দাঁড়িয়ে থাকায় স্তিমিত গলায় তরুণ কিছু তথ্য জানাল কিনা, সেটাও জানা গেল না দূর থেকে। অফিসার তাঁর তীব্র কটাক্ষ কয়েকবার অগ্নিদীপ্ত বজ্রবাণের মত তরুণের ওপর নিক্ষেপ করে প্রায় অনুচ্চারিত উচ্চারণে হিস্‌হিস্ করে সম্ভবত অনেকগুলো কথাই উচ্চারণ করলেন। কিন্তু সেগুলো অন্যদের শোনাবার জন্য ছিল না বলে কেউই শুনতে পেলেন না। শুধু মাথা নিচু করে কয়েকবার যন্ত্রমানবের মত মাথা নাড়তে দেখা গেল অদ্ভুত আচরণের ছেলেটাকে। কিন্তু এতবড় বিরাট ভয়াল ব্যাপারটা রহস্যের কুণ্ডলি পাকিয়ে গুটিয়ে গেল সেখানেই। বোঝা গেল এ দেশের ওপেন সোসাইটিতে মানবাধিকারের দরজাগুলো উন্মুক্ত থাকা সত্ত্বেও নাগরিকের অধিকার ভোগ এবং কর্তব্য পালনের সব সীমারেখা সর্বত্রই সংরক্ষিত আছে সংযতভাবে। তাই যে রহস্যের সত্যতা উদ্ধার করায় বিমানবন্দরের সিকিউরিটি পুলিশ অফিসারের ওপর শতভাগ দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে, আপাতত অনধিকারের প্রশ্ন থাকায় প্লেন যাত্রীদের তাকে জানবার অধিকার এই মুহূর্তে বিন্দুমাত্রও নেই।

অফিসাররা চলে গেলেন একটু পরেই। ক্রমে যাত্রীদের ভিড়ভাট্টা বাড়তে বাড়তে পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে দু'পাশের বোর্ডিং লাউঞ্জের নন্ রিমুভ্যাল চেয়ারগুলো। বাইরে মেঘে ঢাকা সূর্যের দুর্বল রশ্মি আলোকিত করতে চাইছে পাতলা অন্ধকারের প্রহেলিকাময় আবরণ। নিয়নবাতির আলোর ধার তাই অনেকটাই ম্রিয়মাণ এখন। সামনের ঝুলন্ত টিভি স্ক্রিনে কেউ কেউ সজাগ দৃষ্টি ছুঁয়ে নানান বিষয়ের সংবাদ নিচ্ছেন। কিংবা যথাসময়ে

শিকাগো পৌঁছে পরবর্তী গন্তব্যস্থলের কানেক্টিং ফ্লাইট ধরা তাদের সম্ভব কি-না, হয়তো-বা তারই খবরাখবর নিচ্ছেন সচেতনভাবে। কেন-না ফ্লাইট ডিপারচারের স্ট্যাটাসগুলো বারবার যেখানে ভেসে উঠছিল সেখানে লেখা ছিল– আমেরিকান এয়ারলাইনস ফ্লাইট নম্বর ৪৩৮১, ওহারে বিমানবন্দরের উদ্দেশে সিনসিনাটি ছেড়ে যাচ্ছে সকাল ছয়টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে।

ভুক্তভোগীমাত্রের জানা, দেশান্তরের যাত্রায় প্লেন মিস করার হ্যাপা অনেক। মনে মনে আমরা এখন নিশ্চিন্ত, শিকাগো শহরে সুনির্দিষ্ট সময়েই পৌঁছে যাচ্ছে আমাদের বিমান। হঠাৎই পাশে বসা এক বৃদ্ধ পিতা নিউজপেপারের পাতাগুলো একান্ত মনে পড়তে পড়তে গম্ভীর মুখ তুলে বিরস গলায় নিজের তরুণী কন্যার কাছে ফিসফিস করলেন একবার– স্টক মার্কেটে আবারও ধস নামার সম্ভাবনার কথা বলা হচ্ছে রাইয়া! গত সপ্তাহে সে জন্যই তোমায় বলেছিলাম বিক্রি করে দিতে! তাতে লাভ কিছু না হলেও লোকসানটা এড়াতে পারতে! কিন্তু ড্যাড এসব নিয়ে তোমার উতলা হবার কোন কারণ নেই! বিক্রি করলেই তো পরের বছর গুচ্ছের টাকা ওই ইনকাম ট্যাক্সের ট্রাপে গিয়ে পড়বে! শুধু শুধু লাভ না করে স্টক বিক্রি করে ট্যাক্স কেন বাড়াতে যাব? ধৈর্য ধর! অর্থনৈতিক অবস্থা চাঙ্গা হলে অনেক স্টকই রিশেপ করে যাবে! গুজবে কান দিয়ো না!

বোর্ডিং শুরু হয়ে গেল। ঘড়িতে কাঁটায় ছ'টা বেজে কুড়ি মিনিট। সাতসকালেও সুদীর্ঘ লাইন পড়েছে ৪৩৮১ নম্বর ফ্লাইটের জন্য। যাত্রীরা একে একে দীর্ঘ প্যাসেজ পেরিয়ে প্রবেশ করছেন বিশাল বিমানের অভ্যন্তরে। কোথাও কোন অনিয়ম নেই। বোর্ডিং থেকে আরম্ভ করে প্লেনের ওভারহেড কম্পার্টমেন্টে লাগেজ রাখার কাজ, সমস্তই মাত্র দশ মিনিটে সম্পন্ন হল সুচারুভাবে। চাকায় ভর করে বিমান এবার ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। প্লেন ছেড়ে যাচ্ছে যথাসময়েই অর্থাৎ সকাল ছয়টা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিটে। পাইলট, কো-পাইলটের ককপিট থেকে এবার ঘোষিত হচ্ছে সেই মুহূর্তের স্থানীয় আবহাওয়ার মনমেজাজের সংবাদ। তারিখ ২০১২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর। মঙ্গলবার।

দুই. চিলের ডানার মত...

প্লেন এখন এতটাই উঁচুতে উঠে এসেছে যে অনেকখানি নিচে পড়ে আছে স্তরীভূত মেঘের সীমানা। সূর্যস্নাত নরম আকাশের নীল সমুদ্র পেরিয়ে দুর্নিবার গতিতে ছুটে চলেছে আমেরিকান এয়ারলাইনসের ৪৩৮১ নম্বর ফ্লাইট। জানালার পাশে আসন হওয়ায় এক ঢাল সোনাসোনা তরল আলো ছড়িয়ে রয়েছে আমার কোলের ওপরে। ওভাল শেপ জানালার কাচ দিয়ে যেমন প্রতিবার চোখে পড়ে নীলাভ সুতোর মত বিসর্পিল ভঙ্গিতে এঁকেবেঁকে পড়ে থাকা নিচের দুরন্ত ওহায়ো নদীটাকে, সে রকম দৃশ্য আজ আর চোখে পড়ছে না। তার বদলে স্তরে স্তরে আপন খেয়াল-খুশিমত মহাশূন্যের নিঃসীম প্রান্তর জুড়ে ফুটে রয়েছে চারু মেঘের কারুকাজ। কোথাও সেই মেঘ ঝুলে আছে এবড়োথেবড়ো অমসৃণ চেহারা নিয়ে পাহাড়ের মত উত্তুঙ্গ হয়ে। কোথাও সে রাশি রাশি তুলোর পেঁজায় ছড়িয়ে পড়েছে বন্ধনহীন উল্লাসে। কোথাও সাদা ফুলের পাপড়ি মেলে অনবদ্য সজ্জায় সজ্জিত। আবার কোথাও বা সেই মেঘ টুকরো টুকরো অংশ হয়ে ছেঁড়াখোড়া চেহারায় দলগোত্রহীনভাবে চিলের ডানার মত উড়ে যেতে চাইছে হাওয়ার পালে পাল্লা দিয়ে সঙ্গী হবার আকাঙ্ক্ষায়। রানওয়ে থেকে টেক অফ করার মুহূর্তে ওহায়ো নদীর বুকের ওপরে যেসব যাত্রীবাহী ভাসমান ক্রুজ চোখে পড়েছিল, তারাও সবাই হারিয়ে গেছে দৃশ্যমানতার বাইরে। এবার মহাশূন্যের ভারহীন স্পেসে শুধুই ভেসে বেড়ানো দীর্ঘ সময় ধরে।

নিজের আসনে বসার আগেই চোখে পড়েছিল, ঠিক সামনের চারটি আসনে একজন ষাটোর্ধ্ব সাদা মহিলা তিনটি চাইনিজ অরিজিন শিশুকে সিটবেল্ট পরিয়ে দিচ্ছেন পরম মমতায়। তাদের দুটো ছেলে। একটি মেয়ে। বয়স সম্ভবত ছয় থেকে তিনের বেশি নয়। মেয়েটাই সব থেকে বড়। সিল্ট বেল্ট পরে নিতে নিতেই কানে এসেছিল– এ্যালা, না! আমি বলছি সিটবেল্ট একদমই খুলে রাখার চেষ্টা করবে না এখন! ফাসেন ইট! ফাসেন ইট! এক্ষুনি! হ্যাঁ এক্ষুনি বাঁধো! এরপর একটুক্ষণের নীরবতা কাটতে না কাটতেই কচি স্বরের মিঠে বুলি শোনা গিয়েছিল– কিন্তু মামি, আমি এখন রেস্টরুমে যেতে চাইছি। এখন নয় হানি! তোমার মাথার ওপরে সাইনটার দিকে তাকাও। দেখ, ওখানে সিটবেল্ট খুলতে বারণ করা

হচ্ছে। ওই চিহ্নটা যখন মুছে যাবে, তখন তোমায় নিয়ে যাব। কিন্তু কেন বারণ করা হচ্ছে মামি? কারণ প্লেনটা এখন তার পজিশন বদল করছে রানওয়ে ছেড়ে আকাশে উড়ে যাবার জন্য। সিটবেল্ট না পরে রাখলে পড়ে যাবার আশংকা থাকবে। এখানকার সব নির্দেশই তোমায় অনুসরণ করতে হবে সুইটি।

আমার শ্রবণেন্দ্রিয় সচেতন হয়েছে কচিকণ্ঠে 'মামি' সম্বোধন শুনে। কেন-না প্রথম দর্শনে ধারণা হয়েছিল, শিশুগুলো সম্ভবত ভদ্রমহিলার ছেলে কিংবা মেয়ের ঘরের ছেলেপুলে। আজকাল সাদা ছেলেমেয়েদের চিনা স্ত্রী কিংবা স্বামী সংগ্রহের বিষয়টি আমেরিকায় বিরল নয় এবং তাদের বংশধররাও প্রধানত পিতামাতার চেহারার জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ডোমিন্যান্ট ফিচারগুলো প্রাপ্ত হয় বায়োলজিক্যাল নিয়ম ধরে। যেমন সাদাদের সঙ্গে চাইনিজদের মিলনে যে শিশুরা জন্মলাভ করে, তারা সাধারণত চাইনিজ ডোমিন্যান্ট ফিচারে নাক ও চোখের প্রভাব এড়াতে পারে না একেবারেই। সাদাদের থেকেও সন্তানরা পায় চুল এবং গায়ের রঙ। সব মিলিয়ে যে চেহারা এরা প্রাপ্ত হয় সেটা একেবারেই নতুন রকমের। নতুন মানুষের। সেটা নতুন রেসও তৈরি করে বটে। হয়তো এভাবেই ভবিষ্যৎ বিশ্বে তৈরি হতে থাকবে মানবজাতির নতুন নতুন প্রজাতি। বহুদূরের কোন এক সুদূর ভবিষ্যতে বর্তমানে অস্তিত্বময় ভিন্ন ভিন্ন রেসের এইসব মানুষই হয়তো-বা হয়ে যাবে আজকের প্রাগৈতিহাসিককালের ইতিহাসের মতই আরও একটি দূর অতীতের ইতিহাস। যা সেই ভবিষ্যতের প্রত্নতত্ত্ব আর নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানীদের কাছে হয়ে উঠবে মননশীল গবেষণার অফুরন্ত আকর্ষণীয় বিষয়।

অবশ্য এ্যালার মুখে মাতৃ সম্বোধন শুনে ভুল যখন ভাঙল, তখন অনুমান করতে বিলম্ব হয়নি যে কারণেই হোক ষাটোর্ধ্বা এই প্রৌঢ়া রমণী তাদের চিন, ক্যাম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম কিংবা লাওসের কোন এতিমখানা থেকে দত্তক এনেছেন নিজের অপত্যস্নেহের দাবি মেটাতে। অথবা আরও দশজন বিশ্বপ্রেমিক মানবহিতৈষী যেমন সহানুভূতিশীল বিশ্বের অসহায় মানুষের কল্যাণ কামনায়, ইনিও হয়তো-বা তাঁদেরই দলের একজন। বিভিন্ন দেশ থেকে কুড়িয়ে আনা শিশুদের দায়িত্বভার গ্রহণ করা বড় মাপের ফিলানথ্রপিস্ট। উনিশ শতকের গোড়া থেকে ইউরোপ-আমেরিকায় শিল্পবিপ্লবের ফলে নিষ্পেষিত শিল্পশ্রমিকদের সাহায্যের উদ্দেশে যাঁদের কর্মধারা গড়ে উঠেছিল। কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই মনে হল– যিনি পিতৃ মাতৃহীন শিশুগুলোকে মাতৃস্নেহে লালন করার দায়িত্বভার কাঁধে নিয়েছেন, শিশুরা তাঁকে 'মামি' সম্বোধন করবে না তো কাকে করবে আর?

প্রতিটি আসনের সঙ্গেই ছোট ছোট এ্যাটাচড টিভিতে যাত্রীরা হরেক বিষয়ের অনুষ্ঠান দেখছেন নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে। পেছনের আসনে একটি ইয়ং বয়সের সুব্রামনিয়াম দম্পতি বসেছেন সেটা জানা গেল এয়ার হোস্টেস পরিবেশিত একটি সংবাদবিশেষের বক্তব্য থেকে। তিনি অপ্রস্তুতভাবে বললেন– মিস্টার সুব্রামনিয়াম, আপনার ছেলের জন্য গরম দুধ দিতে পারছি না বলে দুঃখিত! চাইলে ক্র্যাকারের সঙ্গে আপেল জুস দিতে পারি। মিস্টার সুব্রামনিয়াম সুবিনয়ে বললেন– ধন্যবাদ! সেটাই দিন তাহলে। বোঝা গেল সুব্রামনিয়াম তার শিশুপুত্রের জন্য এদের কাছে আগেই দুধের অনুসন্ধান করেছিলেন। এয়ার হোস্টেসের নামটা চোখে পড়ল বুকে আঁটা ট্যাগের দিকে দৃষ্টিপাত করতেই। আরিয়ানা গোভাস্কি। চেহারায় সুদীর্ঘ এবং তন্বী তরুণী। কাঁকড়াবিছের মত অসম্ভব এক্সপ্রেসিভ একজোড়া চোখ। চলে যাওয়ার সময় আমার দিকে নজর পড়তেই এক ঝলক হাসলেন সাঁঝবেলাকার শুকতারাটির মত। সুব্রামনিয়াম সক্ষোভে জানতে চাইলেন পুত্রের কাছে– আয়ুশ, এয়ারপোর্টে যখন তোমাকে বারবার খেতে বলা হয়েছিল, তখন কিছু খেলে না কেন? তখন তোমায় বারবার করে কি বলিনি, শিকাগো পৌঁছনোর আগে কিন্তু খাবার পাবে না? এখন তাহলে খেতে চেয়ে এভাবে বায়না ধরেছ কেন? উত্তরে আয়ুশের মায়ের জবাব শোনা গেল ছেলের পক্ষ থেকে– কী করে খাবে? ওর চোখের ঘুমঘোরই তো তখনো কাটেনি ভাল করে! তাহলে তুমিই কেন ওর জন্য বাড়ি থেকে কিছু শুকনো খাবার নিয়ে এলে না? জানই তো, এত কম সময়ের প্লেন জার্নিতে আজকাল ক্র্যাকার কিংবা চিনেবাদাম ছাড়া আর কিছু খেতে দেয় না? শুধু শুধু আমাকে...! মিসেস সুব্রামনিয়ামের কণ্ঠে এবার নরম অভিযোগ ধ্বনিত হল– এটাই-বা কী রকম? এতবড় প্লেনে এতগুলো

যাত্রী যাচ্ছে, তাদের ভেতর ছোট বাচ্চা থাকাই তো স্বাভাবিক! একটু দুধ কি এঁদের রাখা উচিত নয়?

আমার আসনের দুই সারি পরেই সামনের সিটের এক চিনা ভদ্রলোক ওভারহেড কম্পার্টমেন্ট থেকে লাগেজ নামাতে গিয়ে নাগাল না পেয়ে হ্যাঁচকা টানে পাশেরটাই ফেলে দিলেন মেঝের ওপর অনাকাঙ্ক্ষিত শব্দ তুলে। সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষুব্ধ মেজাজের অস্ফুট প্রতিক্রিয়া শোনা গেল পাশের থেকে– ইস! এই চিনুগুলোর এদেশে এসে বড্ড বাড় হয়েছে দেখছি! এক ঘণ্টাও সময় পার হয়নি প্লেন ছেড়েছে, দেখ এরই মধ্যে লাগেজ ধরে টানাটানি! স্পষ্ট মন্তব্য সুস্পষ্ট বাংলা ভাষায়। ডক্টর ঘোষ আমার কানের কাছে ফিসফিস করল বাংলায় কথা বলছে! বাঙালি! গালাগাল দিয়ে ভাবছে এখানে কোন বাঙালি নেই, অতএব কেউই বুঝতে পারছে না কিছু! বলেই মজা পেয়ে হাসল সামান্য। চিনা ভদ্রলোক নিজের ছোট্ট ভুলটাকে অপরাধ মনে করে অপ্রতিভ চেহারা নিয়ে রীতিমত কসরৎ করতে করতে লাগেজটাকে রাখতে গেলেন যথাস্থানে। তারপর নিজের দেহের উচ্চতার কারণে পৌঁছতে না পারায় অপ্রস্তুত দৃষ্টি ছড়িয়ে তাকালেন আশেপাশে– সরি! আই ক্যান্ট রিচ দেয়ার! কাকে উদ্দেশ্য করে বললেন কে জানে। কেবিন ক্রু কিংবা এয়ার হোস্টেস কেউই কাছাকাছি ছিলেন না। পরিবর্তে গম্ভীর চেহারা নিয়ে একজন সুদর্শন সাদা তরুণকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। যিনি একটিও কথা না বলে চাইনিজ ভদ্রলোকের হাত থেকে ভারী লাগেজটা তুলে অনায়াসেই আঁটিয়ে দিলেন সঠিক জায়গায়। কৃতজ্ঞতায় স্মিত হেসে বারকয়েক ধন্যবাদ জানিয়ে ওভারহেড কম্পার্টমেন্ট বন্ধ করে নিজের আসনে ফিরে গেলেন চিনা ভদ্রলোক। কিন্তু লাগেজ নামাবার আর কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না, যতক্ষণ না আমেরিকান এয়ারলাইনস ৪৩৮১ ফ্লাইট অবতরণ করল ওহারে বিমানবন্দরে।

সূর্যের নাগাল ছেড়ে যাত্রীবোঝাই উড়োজাহাজ এখন মেঘের আড়াল ধরে ভাসতে ভাসতে উড়ে যাচ্ছে মহাশূন্যের বন্ধনহীন পারাবারে। একটু আগেই ফ্লাইট সিস্টেমের ইন্টারফোনের মাধ্যমে যাত্রীদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ত্রিশ মিনিটের মধ্যে আমরা অবতরণ করতে চলেছি। চোখে পড়ছে প্লেনের বিশাল ডানাগুলো স্তরে স্তরে ঠেসে থাকা ঘন মেঘের সামিয়ানা কেটে ক্রমশই আঁধারঘেরা দৃষ্টিহীন পরিবেশের ভেতর দিয়ে নিচে নামছে সাঁইসাঁই করে। কয়েক মিনিটের মধ্যে তার সামনের চাকা স্পর্শ করল কঠিন কঠোর কংক্রিটের বুক। জোর ধাক্কায় ৪৩৮১ নম্বরের বিশাল দেহটা একবার কেঁপে উঠল শিহরন তুলে। তারপরেই পুরো শরীরটা ব্যালান্সড হতে শান্ত হয়ে গেল সে। মাত্র দুই ঘণ্টা ত্রিশ মিনিটে ওহায়োর সিনসিনাটি থেকে ইলিনয় রাজ্যের কসমোপলিটান শিকাগো শহরের এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলেন যাত্রীরা। জানালার ফাঁকে বাইরে তাকাতে মনে হল, সম্ভবত ঘণ্টাখানিক আগেই সেখানে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে।

• আগামী সংখ্যায়

দীপিকা ঘোষ
প্রবাসী বাঙালি কথাসাহিত্যিক

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

লর্ড কার্জন ভারতে ব্রিটিশ শিক্ষার মান সম্পর্কে স্বদেশবাসীকে অবহিত করার জন্যে এক ভারতীয় শিক্ষাবিদকে ব্রিটেনে পাঠাতে চান। দিন দুয়েক পরে ঐ ভারতীয় ভদ্রলোক জানিয়ে দিলেন, তিনি যেতে পারবেন না, মায়ের অনুমতি নেই। কার্জন বললেন, মাকে বলুন স্বয়ং ভাইসরয়ের আদেশ। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে অকুতোভয় মানুষটি বললেন, ভাইসরয় হোন আর যেই হোন, তাঁর কাছে মায়ের আদেশই বড়। এই প্রখর আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সাহসী শিক্ষাবিদের নাম আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করেন।

প্রখ্যাত ফরাসি পণ্ডিত সিলভিয়া লেভি তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 'বাংলার এই বাঘের যদি ফ্রান্সে জন্ম হত, তিনি ফরাসি বাঘ জর্জ ক্লেমেন্সকেও ছাপিয়ে যেতেন। গোটা ইউরোপে আশুতোষের সমকক্ষ কেউ নেই।'

স্যার আশুতোষের জন্ম ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন কলকাতার বউবাজারে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে। তাঁর বাবা গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন তৎকালের বিখ্যাত চিকিৎসক এবং সাউথ সাবার্বান স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। কৈশোরে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎ পান। এই নৈষ্ঠিক ও নির্ভীক শিক্ষাব্রতী তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেন।

মেধাবী ছাত্র ছিলেন আশুতোষ। ১৮৭৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করে তিনি 'ফার্স্ট গ্রেড' বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৮০ সালে ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। এখানে সহপাঠী হিসেবে পান প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও নরেন্দ্রনাথ দত্ত [পরবর্তীকালের বিখ্যাত রসায়নবিদ আচার্য পিসি রায় ও স্বামী বিবেকানন্দকে। ১৮৮৩ সালে স্নাতক পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে 'রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ' বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৮৫ ও '৮৬ সালে তিনি যথাক্রমে গণিত ও পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে তিনিই প্রথম শিক্ষার্থী যিনি এ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। আইন শাস্ত্রে অধ্যয়নকালে তিনি রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন। এ সময় তিনি একটি সরকারি চাকরিও লাভ করেন। কিন্তু চাকরির চেয়ে গণিত ও পদার্থ বিদ্যায় গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনাকে তিনি শ্রেয় বিবেচনা করে সে চাকরিতে যোগ দেননি। মাত্র ২৪ বছর বয়সে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে শুধুমাত্র পরীক্ষা পরিচালন কেন্দ্র থেকে তিনি উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার পীঠস্থানে পরিণত করেন। ১৯০৪ সালে কলকাতা হাই কোর্টে বিচারক পদে নিযুক্তি লাভের পর তিনি রাজনীতি থেকে সরে এসে শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। এ সময় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে তহবিল সংগ্রহে উদ্যোগী হন।

১৯০৬ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মনোনীত হন এবং ১৯১৪ সাল পর্যন্ত একাদিক্রমে আট বছর এ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁর নিরলস শ্রম ও অসামান্য প্রশাসনিক দক্ষতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতে উচ্চ শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়। ১৯১১ সালে ব্রিটিশ সরকার তাকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করে। তুলনামূলক সাহিত্য, নৃতত্ত্ব, ফলিত মনোবিজ্ঞান, শিল্প রসায়ন, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং ইসলামি সংস্কৃতির মত নতুন নতুন পাঠক্রম প্রবর্তন করে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষাকে আরও যুগোপযোগী ও আকর্ষণীয় করে তোলেন। তিনি বাংলা, হিন্দি, পালি ও সংস্কৃত ভাষায় স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা করেন। প্রখ্যাত গণিতবিদ শ্রীনিবাস রামানুজনের গণিত-প্রতিভার তিনিই প্রথম স্বীকৃতি দেন। ড. সি ভি রমনের মত বৈজ্ঞানিক এবং ড. এস রাধাকৃষ্ণণের মত দার্শনিক তাঁরই আবিষ্কার। বাংলার সারস্বতসমাজের পুরোধা হিসেবে তিনি বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, ক্যালকাটা ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটি, সাউথ সাবার্বান কলেজ প্রতিষ্ঠাসহ নানা কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দেন। তিনি ফরাসি, রুশ, পালি ও সংস্কৃত ভাষা জানতেন। শিক্ষাক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্যে বাংলার পণ্ডিত সমাজ তাঁকে 'সরস্বতী' ও 'শাস্ত্র বাচস্পতি' আখ্যায় ভূষিত করেন।

১৯২১ সালে তিনি দ্বিতীয় দফায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মনোনীত হন। কিন্তু লর্ড কার্জনের সময় থেকে বাংলায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের যে সূত্রপাত হয়, এ সময় তা তীব্র হয়ে ওঠে। ফলে লর্ড লিটন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্বশাসন খর্ব করার শর্তে তাঁকে মনোনয়ন দানের প্রস্তাব করেন। তিনি ঘৃণাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। লর্ড লিটন শেষ পর্যন্ত কোন শর্ত ছাড়াই তাঁকে নিয়োগদানে বাধ্য হন। এই অসম সাহসিকতার জন্যে তিনি অচিরেই 'বাংলার বাঘ' নামে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯২৩ সালে তাঁর পঞ্চম দফার উপাচার্যকাল অতিক্রান্ত হয়। তিনি চাইলে আবারও উপাচার্য হতে পারতেন কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ক্রমাগত বিরোধে তাঁর মন সায় দেয়নি। তবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রভাব বরাবর অটুট ছিল।

১৯২৪ সালের ২৫ মে পাটনা হাই কোর্টের অদূরে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেখানে তিনি একটি মামলা লড়তে গিয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৫৮। ১৯৬৪ সালে তাঁর জন্মশতবর্ষে স্মারক ডাক টিকিট প্রকাশ করে ভারত সরকার এই ক্ষণজন্মা শিক্ষাব্রতীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

• নিজস্ব প্রতিবেদন

উপরে ॥ ৭ মে ২০১৬ গুলশানের আইজিসিসি মিলনায়তনে হিমাদ্রীশেখর তালুকদার ও শ্রীমতী শিমু দে-র রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন

নিচে ॥ ১. ২৭ মে ২০১৬ গুলশানের আইজিসিসি মিলনায়তনে কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে খিলখিল কাজী ও সালাউদ্দিন আহমেদের নজরুলসংগীত পরিবেশন ২. ০৬ মে ২০১৬ রবীন্দ্র-জয়ন্তী উদযাপনের শুভারম্ভ ৩. রবীন্দ্র-জয়ন্তী অনুষ্ঠানমালায় শ্রীমতী প্রমিতা মল্লিকের সংগীত ও ব্যাখ্যা পরিবেশন ৪. ২০ মে ২০১৬ গুলশানের আইজিসিসি মিলনায়তনে নজরুল-জয়ন্তী অনুষ্ঠানে অনিন্দিতা কাজীর 'অনিন্দিতার ঠাকুরদাদার ঝুলি' শীর্ষক গান, আবৃত্তি ও স্মৃতিচারণ ৫. ২০ মে ২০১৬ ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন ফুটবল দল ও বাংলাদেশ স্পোর্টস জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন ফুটবল দলের প্রীতি ফুটবল ম্যাচে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। আরও উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ড. শ্রী বীরেন শিকদার

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra June 2016

সত্যমেব জয়তে

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা

জ্ঞাতব্য তথ্য

নতুন আইভিএসি কেন্দ্র

ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপলিকেশন সেন্টার (আইভিএসি)-এর মাধ্যমে ভারতীয় ভিসা আবেদন গ্রহণের জন্য ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার স্বীকৃত এজেন্ট এস্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা দিচ্ছে যে, এখন থেকে ভিসার আবেদনপত্র গ্রহণ ও বিতরণের জন্য ঢাকার উত্তরাসহ বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুরে নতুন আইভিএসি খোলা হয়েছে।

কার্যক্রমকাল

রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার– আবেদনপত্র গ্রহণ সকাল ৮.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা।
রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার– আবেদনপত্র বিতরণ বিকাল ৩.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০টা।

ঠিকানা

আইভিএসি-র সব কেন্দ্রে সব ধরনের ভিসা আবেদন গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশে এখন নিম্নোক্ত আইভিএসি কেন্দ্রে বিদ্যমান। এগুলো হচ্ছে: আইভিএসি, গুলশান, ঢাকা ॥ আইভিএসি, মতিঝিল, ঢাকা ॥ আইভিএসি, ধানমন্ডি, ঢাকা ॥ আইভিএসি, উত্তরা, ঢাকা ॥ আইভিএসি, চট্টগ্রাম ॥ আইভিএসি, সিলেট ॥ আইভিএসি, খুলনা ॥ আইভিএসি, রাজশাহী ॥ আইভিএসি, বরিশাল নর্থ সিটি সুপার মার্কেট দ্বিতীয় তলা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, অমৃতলাল দে রোড, বরিশাল (এলাকা: বরিশাল, বরগুনা, ভোলা, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী ও পিরোজপুর) ॥ আইভিএসি, ময়মনসিংহ, ২৯৭/১ মাসকান্দা দ্বিতীয় তলা, মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ড, ময়মনসিংহ (এলাকা: জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর, টাঙ্গাইল ও ভালুকা) ॥ আইভিএসি, রংপুর, জে বি সেন রোড, রামকৃষ্ণ মিশনের বিপরীতে, মহিগঞ্জ, রংপুর (এলাকা: রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও এবং লালমনিরহাট)। উল্লেখ্য, ঢাকার বাইরের এলাকার ভিসা আবেদন ঢাকার কোন কেন্দ্রে গ্রহণ করা হবে না।

ভিসা আবেদন করার সময় আবেদনকারীদের সঠিক বিভাগ নির্ধারণ করে আবেদন করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সব দলিল সঠিক, সম্পূর্ণ ও অবিকল হওয়া চাই। আবেদনকারীদের এজেন্ট ও মধ্যবর্তী মানুষদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার এবং এসব ক্ষেত্রে নিকটতম থানা/আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আইভিএসি বাংলাদেশে তার পক্ষে কাজ করার জন্য কোন ব্যক্তি/সংস্থাকে অনুমোদন দেয়নি।

পুনর্নির্ধারিত প্রক্রিয়া ফি

১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে পুনর্নির্ধারিত ভিসা প্রক্রিয়া ফি নিম্নোক্ত হারে কার্যকর হবে: ১. ঢাকার সব আইভিএসি কেন্দ্র– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০। ২. আইভিএসি, চট্টগ্রাম– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৩. আইভিএসি, রাজশাহী– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৪. আইভিএসি, সিলেট– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৫. আইভিএসি, খুলনা– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৬. আইভিএসি, বরিশাল– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ৭. আইভিএসি, ময়মনসিংহ– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৩. আইভিএসি, রংপুর– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০।

আলোকচিত্র আপলোডের নতুন পদ্ধতি:

আবেদনকারীদের অনলাইন আবেদনপত্রে দেওয়া নির্ধারিত জায়গায় তাদের আলোকচিত্র স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। স্ক্যানকৃত আলোকচিত্র ছাড়া আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে।

হেল্পলাইনসমূহ

হেল্পলাইন টেলিফোন/ফ্যাক্স/ ই-মেইলসমূহ: ০০-৮৮-০২ ৮৮৩৩৬৩২২ ॥ ০০-৮৮-০২ ৯৮৯৩০০৬ ॥ ০০-৮৮-০১৭১৩ ৩৮৯৪৯৯ ০০-৮৮-০২ ৯৮৬৩২২৯ (ফ্যাক্স) ॥ visahelp@ivacbd.com. আরো সাহায্যের জন্য ই-মেইল: visahelp@hcidhaka.gov.in
ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যে-কোন ধরনের প্রশ্নের জবাব পেতে ভিজিট করুন: http://www.ivacbd.com/faq.php

জনস্বার্থে ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা কর্তৃক প্রচারিত